গ্রন্থকারের অন্য বই :

লেখা

(সরস প্রবন্ধ ও গল্প)

দাম দুই টাকা

শুভশ্রী

শ্রীজ্যোতির্ম্ময় ঘোষ
("ভাস্কর")

১৯৪১

ভূমিকা

আমার কয়েকটি গল্প "লেখা" বইখানিতে প্রকাশিত হইয়াছিল। আরো গোটাকয়েক গল্প প্রকাশিত হইল।

"শুভশ্রী"
কলিকাতা

শ্রীজ্যোতির্ময় ঘোষ

সূচীপত্র

দার্জিলিং এফেক্ট

১

শিয়ালদহ স্টেশন। একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর ফিটন গাড়ী হইতে একটি বিছানা, দুইটি স্যুটকেস, একটি ফ্লাস্ক, একটি অ্যালুমিনিয়মের কুজা এবং একটি ছাতা লইয়া যাহারা নামিল তাহাদের নাম ললিত এবং অমিয়া। সাংঘাতিক বয়স, পঁচিশ আর ষোল।

দার্জিলিং মেলের একখানি ইণ্টারক্লাসের কামরায় উঠাইয়া দিয়া বক্‌সিস লইয়া কুলি চলিয়া গেল। জানালা হইতে অমিয়া দেখিল একটি আধুনিক মহিলা ব্যাগ-হাতে খুট্ খুট্ করিয়া চলিয়াছেন, সঙ্গে পুরুষ মানুষ নাই, পিছনে কুলির মাথায় জিনিষপত্র। অমিয়া ললিতকে বলিল, দেখলে, কি বেহায়া। অমিয়ার নিজের পা খালি, একখানি সাধারণ সাড়ী সাধারণভাবেই পরিয়াছে, তার উপরে একখানি সিল্কের চাদরে সর্বাঙ্গ ঢাকা। গরম চাদর স্যুটকেসে আছে। শিলিগুড়ি গিয়া বাহির করিবে। ললিত পরিয়াছে এল্‌বার্ট শ্লিপার, মিলের ধুতি, গলাবন্ধ কোট, তার উপরে একখানি উড়ানি।

দার্জিলিং মেল ছুটিয়াছে। অমিয়া জানালার ধারে বসিয়া আছে। একবার জিজ্ঞাসা করিল, কত জোরে চল্‌ছে বলত? ললিত বলিল, তা পঞ্চাশ মাইল হবে। তুমি শোবে না?

না, আমি সারা ব্রিজ না দেখে শোব না।

সে অনেক দেরি। এখন শুয়ে পড়। সারা ব্রিজের কাছে এলে আমি ডেকে দেব।

তুমিও যদি ঘুমিয়ে পড় ? না, আমি এখন শোব না।

সারা ব্রিজ পার হইয়া অমিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। ললিত একবার ঘুমায়, একবার জাগে, এমনি করিয়া রাত কাটাইল। জলপাইগুড়ি পার হইয়া আসিয়া সম্মুখে ডানদিকে কাল কাল পাহাড়ের সারি দেখাইয়া ললিত বলিল, ঐ দেখ হিমালয় পাহাড়।

আমরা কি ওখানে যাব ?

হ্যাঁ, ওর অনেক উপরে।

শিলিগুড়ি। গাড়ী প্ল্যাটফর্মে আসিতেই সম্মুখের প্ল্যাটফর্মে ডি. এইচ. আর-এর গাড়ী দেখিয়া অমিয়া বলিল, ও কি ! বেশ খুদে খুদে গাড়ী তো !

হ্যাঁ, ওই গাড়ীতে করেই তো আমরা পাহাড়ের উপরে উঠবো।

ও কি ! ইঞ্জিন নাকি ? অতটুকু ? ও ত আমাদের বাড়ীর সামনে যে স্টীম-রোলারটা দাঁড়িয়ে আছে, প্রায় তারই মতন।

জিনিষপত্র লইয়া একখানি গাড়ীর জানালার ধারে স্থান করিয়া লইয়া ললিত বলিল, দেখ, তুমি এই বাঁ ধারে এখানে বস, বাঁ দিক থেকেই দৃশ্য ভাল দেখা যায়। অমিয়া ক্রমাগতই হাসিতেছে। ললিত জিজ্ঞাসা করিল, কেবলই হাস্‌ছ যে !

কি খুদে খুদে গাড়ী ! আমার ভারি হাসি পাচ্ছে।

কেন ? হাওড়া-আমতা লাইনের গাড়ীও তো এই রকম ; দেখনি বুঝি ?

গাড়ী ছাড়িল, তিন টুকরা করিয়া। মাঝের টুকরায় ললিতরা। অমিয়া বলিল, তিনখানা গাড়ী একসঙ্গে যাচ্ছে কেন ?

নইলে ইঞ্জিনে টান্‌তে পারে না। আগে বড় একখানা গাড়ীর

সামনে আর পিছনে দুখানা ইঞ্জিন থাকৃতো। তাতেও সুবিধে হ'ত না। তাই আজকাল এই রকম করেছে।

গাড়ী শুকনা ছাড়িয়া বনের মধ্য দিয়া, পাহাড়ের গা বাহিয়া, আঁকিয়া বাঁকিয়া, ঘুরিয়া ফিরিয়া, ঝক্‌ঝক্-ঝক্‌ঝক্ ঝিকিঝিকিঝিকি শব্দ করিতে করিতে ক্রমাগত উপরে উঠিতেছে আর অমিয়া তন্ময় হইয়া একবার এদিক একবার ওদিক চাহিয়া দেখিতেছে। ট্রেন ঘুরিবার সময়ে ইঞ্জিন দেখা যাইতেছে। কখনও সামনের ট্রেনখানি দেখা যাইতেছে। আবার অদৃশ্য হইতেছে। কখনও পিছনের ট্রেনখানি নীচে দেখা যাইতেছে, কখনও মাথার উপর দিয়া আবার কখনও পায়ের তলা দিয়া রেলের লাইন গিয়াছে, লুপের কাছে গাড়ী ঘুরপাক খাইতেছে, রিভার্সের কাছে গাড়ী পিছনে চলিতেছে, এই সব দেখিতে দেখিতে অমিয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে। তিনধারিয়া হইতে এবং কার্সিয়ং হইতে নীচের সমতলভূমি কেমন সুন্দর দেখায়! অমিয়া প্রত্যেক স্টেশনের উচ্চতাগুলি পড়িয়া দেখিতেছে। ক্রমশ যখন 'ঘুম' আসিয়া পড়িল, তখন ললিত বলিল, এইটে সবচেয়ে উঁচু স্টেশন। এর পরেই দার্জিলিং, খানিকটা নীচে।

দার্জিলিং। বিরাট কাঞ্চনজঙ্ঘা-শ্রেণীর অনুপম সৌন্দর্য দেখিতে দেখিতে তাহারা স্টেশনে আসিয়া পৌছিল এবং একটি নানীর (কুলীরমণী) পৃষ্ঠে জিনিষপত্র চাপাইয়া কার্টরোডের নিকটেই একটি হোটেলে উঠিল।

২

বৈকালে বেড়াইতে বাহির হইয়াছে। অমিয়া বলিল, আমার আজ কেমন নূতন নূতন লাগছে।

নূতন জায়গা, নূতন তো লাগবেই!

তা বলছি নে।

তবে ?

রান্নাবান্না নেই, কুটনো-কোটা নেই, ঝগড়া-ঝাঁটি নেই, দুটো তৈরী ভাত খেয়ে সেজেগুজে বেড়াতে বেরোনো—এ যেন ভাবতেই পার্‌ছিনে।

সেই জন্যেই তো এখানে আসা। দিন কতক নিশ্চিন্ত মনে নির্ঝঞ্ঝাটে বেড়িয়ে নাও।

ম্যেকেঞ্জি রোড বাহিয়া উপরে উঠিতে উঠিতে ললিত বলিল, এই এখানকার বড় ডাকঘর—আর এই একটা বায়োস্কোপ।

রোসো, আমার জুতোর ফিতে খুলে গেছে, বেঁধে নি।

অমিয়া কেডস্ জুতার ফিতা বাঁধিয়া শালখানি গায়ে জড়াইল। ললিত তাহার আলোয়ানখানি দিয়া গলাটা ভাল করিয়া ঢাকিয়া লইল। উঃ! কি কন্‌কনে শীত!

আর একটু উপরে উঠিয়া আর একটি বায়োস্কোপ। তারপর অক্‌ল্যাণ্ড রোডের মোড়ে আসিয়া ললিত বলিল, এই পর্যন্ত মোটর আসতে পারে। এর উপরে মোটর যায় না।

তারপর দুধের দোকান, ফোটোর দোকান, জুতার দোকান, ঔষধের দোকান প্রভৃতি পার হইয়া তাহারা চৌরাস্তায় আসিয়া পড়িল। ললিত বলিল, এটাকে ম্যাল বলে।

ম্যাল মানে কি ?

ম্যাল মানে ?—আচ্ছা, বাড়ী গিয়ে ডিক্‌সনারি দেখে বলব।

আমি আর হাঁটতে পাচ্ছি নে। আমার বুকটাও ধড়্ ফড়্ করছে। বাবাঃ, যেন মনুমেণ্টে উঠছি।

চল, এখানে বেঞ্চিতে একটু বসা যাক।

উভয়ে ম্যালের পূর্বদিকের একখানি বেঞ্চিতে গিয়া বসিল এবং নানাবিধ লোকের যাতায়াত দেখিতে লাগিল।

অমিয়া বলিল, ও মেয়েটা কি বাঙালী ?

হ্যাঁ।

মেমেদের মত ঘাগরা পরেছে কেন ?

সখ।

কি উদ্ভট সখ বল তো! আচ্ছা, ওই যে যাচ্ছে, ওটা কি মেম না সাহেব ?

পিছন থেকে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। এদিকে ফিরুক—ওই যে—ও তো মেম।

ও পেণ্টুলন পরেছে কেন ?

সখ।

এ আবার কেমন ধারা সখ। যত সব—

এইবার চল, অবজারভেটরি হিলের চারিদিকে একটা পাক দেওয়া যাক—কেমন, পার্‌বে তো ?

পার্‌বো, চল।

উভয়ে বেঞ্চি হইতে উঠিয়া বাঁ দিক দিয়া আস্তে আস্তে হাঁটিতে আরম্ভ করিল।

ললিত বলিল, দেখ, লোকগুলো কেবলই তোমার দিকে তাকায়, আমার ভাল লাগে না।

সুন্দরীর দিকে লোকে তাকাবেই তো!

ইস্, ভারি গরব যে!

কেন গরব হবে না? এরই জন্যে তো তুমি তোমার বাবার সঙ্গে পর্যন্ত ঝগড়া করেছ!

এখন আর বাবার রাগ নেই কিন্তু। যাই বল, লোকগুলো ভারি তাকায়।

আমি যদি কালো কুৎসিত হতুম, আর কেউ আমার দিকে না তাকাত, তা হলে তোমার ভাল লাগতো?

তা কারো লাগে নাকি?

তাকালেও ভাল লাগে না, না তাকালেও ভাল লাগে না—তোমাদের মন বোঝাই ভার।

যাক্ গে, যে তাকায় সে তাকাক, তুমি তাই বলে তাকিও না কিন্তু।

বেশ, এই আমি চোখ বুজ্ছি, তুমি আমার আঁচল ধরে টেনে নিয়ে চল।

আঃ! আমি কি তাই বলছি না কি? ঐ দেখ, নীচে কার্টরোড দেখা যাচ্ছে। ওই রাস্তাই শিলিগুড়ি থেকে বরাবর এসেছে।

বাঃ বেশ দেখাচ্ছে তো! নীচে, উপরে, রাস্তার উপর রাস্তা, বাড়ীর উপর বাড়ী, বেশ দেখতে, না?

হ্যাঁ।

আচ্ছা, ডানদিকে দেওয়ালের গায়ে ও লতাগুলো কি? আঙুরের মত পাতা—

ওগুলো আইভি-লতা। তুমি আঙুরের পাতা কোথায় দেখ্লে?

কেন? বি. সরকারের ক্যাটালগে।

ও! ওই দেখ একটা ছোট্ট পার্ক—এখানে ছেলেপিলেরা বেড়ায়—ওর নীচে একটা ছোট্ট যাদুঘর আছে। অনেক প্রজাপতি আছে—আর একদিন দেখা যাবে। একটা বোটানিক্যাল গার্ডেনও আছে একটু নীচে, জেলখানার কাছে। সেখানে অনেক রকম সিজ্ন-ফ্লাওয়ার আছে।

আচ্ছা, একদিন ওদিকে গেলেই হবে। সাম্‌নে ওই মেয়েটাকে দেখছো—ঐ আসছে!

হ্যাঁ, ওর নাম দুরদৃশ্যা।

কি করে জান্‌লে?

একটু এগোলেই বুঝতে পারবে।

ও মা গো! তাই তো, দূরে থেকে কিন্তু—। ঐ দেখ, দেওয়ালের গায়ে কত ফুল ফুটে রয়েছে, ঠিক যেন ছোট বড় নাকছাবির রাশ—ও কি ফুল?

ওগুলো ডেজি।

ঐ যে সেই পড়েছিলাম—What time the daisy decks the green?

হ্যাঁ। ঐটে সাহেবদের ক্লাব, আর ঐ সামনে গেট, পুলিশে পাহারা দিচ্ছে, ঐ লাটসাহেবের বাড়ী।

আরো খানিকটা গিয়া অমিয়া বলিল, নীচে ঐ সাদা গোল পরিষ্কার জায়গাটা কি?

ওটা লেবং রেসকোর্স।

ঠিক যেন পাহাড়ের মাথায় টাক পড়েছে। বেশ দেখাচ্ছে কিন্তু। আচ্ছা, ওগুলো কি? ঐ যে ছোট ছোট ফুলের গাছ, একটা করে শিষ উঠেছে, তার গায়ে ছোট ছোট করবী ফুলের মত ফুল, কোনটা সাদা, কোনটা লাল—

ওগুলোকে ইংরাজিতে বলে ফক্‌স্ গ্লাভ্‌, ল্যাটিন নাম ডিজিট্যালিস্‌, বুকের অসুখের ভাল ওষুধ ওর থেকে তৈরী হয়।

আর ওই সরু সরু পাতা—ঐগুলো।

ওগুলোর সাধারণ নাম ফার্ন, ও অনেক রকম আছে। ঐ দেখ,

দার্জিলিং পাহাড়ের পরেই ওই যে কালো পাহাড়টা, তারপরেই একটু ফাঁক, ঐ ফাঁকের নীচে তিস্তা নদী। বাঁ দিক থেকে রঙ্গিত গিয়ে মিশেছে ওর সঙ্গে। ওর ওপারে ঐ যে একটা ঢালু পাহাড়, তার গায়ে সাদা সাদা বাড়ী—ওই কালিম্পং।

ওখানে কোন পথে যায়?

শিলিগুড়ি থেকে রেল আর মোটর। এখান থেকে ঘোড়া বা বেবি অস্টিন।

যাবে?

এবার আর না। আর একবার দেখা যাবে। সামনের ওই মেমটাকে দেখছ—ওই যে যাচ্ছে—ওর নাম পশ্চাদ্দৃশ্যা।

তাই নাকি?

একটু এগিয়ে চল তাহলেই বুঝতে পারবে।

ও মা গো, তাই তো! পেছন থেকে মনে হচ্ছিল—

এখন কি করবে? অবজারভেটরি হিলের উপরে উঠবে, না বাসায় ফিরবে?

চল বাসায় ফিরি। আজ আর না, বড্ড পরিশ্রম হয়েছে।

তাই চল।

৩

ললিত ও অমিয়া প্রত্যহই বেড়াইতেছে। বেড়াইতেই তো আসা। কলিকাতায় একতালা হইতে দোতালায় উঠিতে আলস্য হয়, আর এখানে আজ জলাপাহাড়, কাল কাটাপাহাড়, তার পর দিন ঘুম—কেবল স্ফূর্তি!

প্রায় দুই সপ্তাহ হইল, উহারা দার্জিলিং আসিয়াছে। কাল টাইগার-

হিল হইতে ফিরিয়া অমিয়ার হাঁটুতে একটু ব্যথা হইয়াছে, আজ আর কোথায়ও যাইবে না। ভাল করিয়া বিশ্রাম না করিলে ব্যথাও সারিবে না, বেড়ানও একেবারে বন্ধ রাখিতে হইবে। ললিতও একা বেশি বেড়াইতে চায় না, আজ অল্প একটু ঘুরিয়া আসিয়া বাসাতেই আছে। দু'জনে গল্প গুজব হইতেছে।

অমিয়া বলিল, দেখ তোমার ধুতিগুলো তো প্রায় সব ময়লা হয়ে গেল। তাছাড়া এ শীতের মধ্যে ধুতি পরলে পায়ে কোমরে ঠাণ্ডাও লাগে। তার চেয়ে বরং একটা বা দুটো ফ্লানেলের পেণ্টুলন করে নাও না—তাতে কি?

আমিও তাই ভাব্‌ছিলাম, কিন্তু—

কিন্তু আর কি? এখানে তো কুলীরাও পেণ্টুলন পরে, ওতে আর হয়েছে কি? সঙ্গে গোটা দুই সার্ট, গোটা কয়েক কলার আর গোটা চারেক টাই হলেই হবে।

দেখি। আর তোমার ওই কেড্‌স্‌, হাঁট্‌তে সুবিধে বটে, কিন্তু ভারি বুড়ো বুড়ো দেখায়।

তাই বলে অত গোড়ালি-উঁচু জুতো আমি পরতে পার্‌বো না—হাঁটতে গিয়ে পড়েই যাব।

বেশি উঁচু নাই হলো। ওই তো সে-দিন বাটার দোকানে দেখ্‌লুম, বেশ অল্প-উঁচু খাসা জুতো রয়েছে, তারই একজোড়া কিনো, তোমার টুকটুকে চরণপল্লবে বেশ মানাবে।

সে দেখা যাবে। তুমি আজই পেণ্টুলনের অর্ডার দিয়ে এসো।

তা দেব'খন। আর দেখ, দুইজনে এই একটা ছাতার মধ্যে ভারি বিচ্ছিরি দেখায়। তুমি একটা ছাতা কেন—ওই যে বেঁটে বেঁটে ছাতাগুলো, নেহাত মন্দ না দেখতে।

আচ্ছা। আর দেখ, একটা ফেল্‌ট হ্যাটের কথা যেন ভুলো না, আর একটা ডোরা-কাটা মাফলার।

আচ্ছা। তোমার ওই সেকেলে আলোয়ান, ওটা ছাড়, হাঁটবার সময় আলোয়ান সামলাতেই প্রাণান্ত। কেবলই ভয় হয়, বুঝি পায়ে আটকে আছাড় খেলে! একটা ওভারকোট হ'লে বেশ হয়—প্লেন দেখে কিন্‌লেই হবে—বেশী দামী নাই হ'ল।

এ কয়দিনের জন্য আর কোট কিনে কাজ নেই, বরং একটা দিদিমণি-মাফলার কিনে দিও, পিঠের উপর দিয়ে দেড় পাক ঘুরিয়ে পরলেই হবে। কিংবা উলের কাজ করা একটা কাশ্মীরী ঢিলা জ্যাকেট, শাড়ীর উপরে প'রে, পকেটে হাত ঢুকিয়ে হাঁটতে বেশ আরাম—পথে কত দেখি! আর তোমার কোটটা যেন ভাল হয়—বেশ মানায় যেন!

হ্যাঁ, একটা টুইডের স্পোর্টস্ কোট কর্‌বো। এখানে গরম কাপড়ের দাম প্রায় কলকাতারই মত—দরজীর খরচও খুব বেশি নয়।

হোটেলের চা আসিতে গল্প বন্ধ হইল।

৪

এক মাস হইতে চলিল। দিনগুলি যেন উড়িয়া যাইতেছে। খাওয়া, বেড়ান আর ছবিওয়ালা পোস্টকার্ডে চিঠি লেখা, এ ছাড়া কোন কাজই নাই। শরীরও দুজনেরই বেশ ভাল আছে। এখন আর চাকরবাকরে বাবু আর মাইজি বলে না, তারা বলে সাব্ আর মেমসাব্। হোটেলের লোকেরা এ পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়াছে। কেহ কেহ বলিয়াছে, এটা দার্জিলিং এফেক্ট—তাতে বয়েই গেল! স্যুট-পরা ললিত আর ওভারকোট-পরা ব্যাগ-হাতে অমিয়া এখন সকলের সামনেই যাতায়াত করে, কোনই সঙ্কোচ নাই।

সেদিন চলিয়াছে বার্চ হিলের দিকে। যেখানটায় সেই কুকুরটার স্মৃতিস্তম্ভ, সেখানে আসিতেই বিপরীত দিক হইতে একটি ঘোড়া লইয়া একটি ভুটিয়ানী আসিয়া বলিল, সাব্, ঘোড়া ?

ললিত বলিল, আমি ও ভুটিয়ানীর ঘোড়ায় চড়্বো না, তুমি চড়্বে, অমি ?

যাও, কি যে বল ?

তাতে কি, একটু চড়ই না। মেমরা তো সবাই চড়ে।

আমি কি মেম নাকি ?

বেশি তফাৎই বা কি ? তাছাড়া এখানে কেউ কোথাও নেই—একেবারে নির্জন। কেউ দেখ্তে পাবে না।

না, ছিঃ, ঘোড়ায় চড়্বো কি !

লক্ষ্মীটি, একবার চড়ই না, দেখি কেমন দেখায় !

তুমি যখন বলছ, আমি চড়ছি। কোথাও যাব না কিন্তু, এখানেই একটু হেঁটেই নেমে পড়্ব। একটু দেখ তো ভাল করে, কোন দিক থেকে কেউ আস্ছে কিনা।

কেউ নেই, এ সময়ে এ পথে কেউ আস্বে না।

নানী এবং ললিত উভয়ে ধরাধরি করিয়া অমিয়াকে ঘোড়ায় উঠাইয়া দিল। পা ঠিকমত রাখা হইলে এবং লাগাম ধরা হইলে ললিত বলিল, এ নানী, তোম মেম সাব্কা ঘোড়াকা পাস খাড়া হো যাও, হাম ফোটো লেগা।

ফোটো তোলা হইয়া গেলেই অমিয়া নামিয়া পড়িল। নানী কিছু বক্‌সিস্ লইয়া বিদায় হইল।

অমিয়া রাগিয়া বলিল, ফোটো তুল্লে কেন ? সবাইকে দেখাবে বুঝি যে, আমি দার্জিলিংএ ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতাম ?

কাউকে দেখাব না, এ আমার কাছে থাকবে অমি, আমাদের ছেলেমানুষির চিহ্ন। যখন বড় হ'ব তখন দেখে হাসি পাবে। ছেলেমানুষিটাই জীবনের আনন্দ, অনাবিল আনন্দ ঐটুকুই। আর সব তো দায়িত্ব, কর্তব্য, সামাজিকতা, বন্ধুত্ব, কুটুম্বিতা—ওসব তো আছেই, চিরদিনই থাকবে। ছেলেমানুষ আর কদিন থাকবে?

যাই কর, ফোটো সাবধানে রেখো। কলকাতায় গিয়ে কাউকে দেখিও না কিন্তু।

সে আমাকে বলতে হবে না, তুমি নিজেই সাবধান থেকো।

৫

এবার ফিরিবার পালা। নূতন জায়গায় আসিলে কিছু কেনা-কাটা করিতে হয় বই কি? কিছু তরকারি কেনা হইল—কপি, মটরশুটি, টমাটো, বীনস্, আনারস, গাজর, বড় এলাচ, আলুবখরা, স্কোয়াস, গোল লঙ্কা, লম্বা কুমড়া ইত্যাদি। কয়েক পাউণ্ড চা আর দুই এক বোতল কমলা-মধু না নিলে কি চলে? হাবেব মল্লিকের দোকান হইতে দু'ডজন কাচের, মুক্তার আর পুঁতির মালা, উলের কাজ করা চটের থলে, দু'খানা ভুটিয়া চাদর, দু'খানা লাসা-সাড়ী, একখানা চায়ের ছড়ি, একখানা কুক্রি, আর একখানা কাশ্মীরী টেবল্‌ক্লথ কেনা হইল। গ্ল্যাডহার্টের দোকান হইতে দুখানা কাঠের ট্রে কেনা হইল, একখানা আঙুরপাতা, আর একখানা পদ্ম-কাটা। মোমের ময়ূর-আঁকা একখানা টেব্‌ল ক্লথও অমিয়া পছন্দ করিয়া কিনিল। একখানা ছবির অ্যালবাম এবং দু'ডজন ছবি-পোস্টকার্ড কেনা হইল। তার মধ্যে, ঝুড়িতে একটি শিশুকে বসাইয়া পিঠে করিয়া একটি ভুটিয়ানী মেয়ে, এই ছবিখানি এন্‌লার্জ করিয়া এবং রং দিয়া আঁকিয়া বাঁধাইয়া লওয়া হইল। এ ছবিখানি

ললিতের ভারি পছন্দ। স্যান্‌ডাকৃফু হইতে এভারেস্ট্‌ শৃঙ্গের দৃশ্যখানিও এন্‌লার্জ করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত ইটালি, বেলজিয়ম এবং জার্মেনিতে প্রস্তুত খাঁটি তিব্বতী, নেপালী এবং সিকিমি জিনিষও এ দোকান ও দোকান হইতে গোটাকয়েক কেনা হইল।

শিয়ালদহে প্ল্যাটফর্মে নামিতেই একটি লোক আসিয়া বলিল,—বাবু, গাড়ী চাই?

নেহি।

কুলি দুইটিকে ডাকিয়া ললিত বলিল,—একঠো ট্যাক্সিমে উঠাও।

বাসায় পৌঁছিয়া কড়া নাড়িতেই ললিতের ছোট বোন অতসী আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। সম্মুখে সাব্‌ এবং মেমসাব্‌ দেখিয়া জিভ্‌ কাটিয়া দড়াম্‌ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া বাড়ীর ভিতরে ছুটিয়া গেল এবং চীৎকার করিয়া বলিল,—ঝি, অ ঝি, দ্যাখ্‌ তো বাইরে কারা?

ইতিমধ্যে দাদা এবং বউদি বাড়ীর ভিতরে ঢুকিয়া পড়িয়াছেন। ললিত বলিল,—কিরে অতু, চিন্‌তেই পার্‌লি নে?

ও মা গো, তোমরা সাহেব হয়েছো, কেমন করে জান্‌বো বল? আগে থেকে জানাতে হয়?

অমিয়া বলিল,—আমি ভাই, কিছু জানিনে, এ সব তোমার দাদার খেয়াল।

হ্যাঁ গো হ্যাঁ, সব দাদার খেয়াল, আর তুমি মাটির পুতুল।

অমিয়া আর অতসী, প্রায় সমবয়সী। মেঝেতে একখানা বড় কার্পেট পাতিয়া স্যুটকেস খুলিয়া বসিয়াছে। এটা তোমার, এটা ছোটদির মেয়ের, এটা পিসিমার ছেলের, এটা ছোট কাকীমার, ইত্যাদি

কথাবার্তা হইতেছে ; ভিক্টোরিয়া ফল্‌স্‌ পিছনে করিয়া যে ফোটো তোলা হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া অতসী বলিল, বেশ, খাসা তো। এর পরের বার কিন্তু একা যেতে পারবে না। আমিও যাব।

এবারেই কেন গেলে না। আমি তো কত বললুম তোমাকে।

ইচ্ছে করেই যাই নি। এর পরের বারে যাব।

জিনিষপত্রগুলি নাড়াচাড়া করিতে করিতে হঠাৎ সেই বার্চহিলে ঘোড়ায় চড়া ফোটো একখানি দেখিতেই খপ্‌ করিয়া তুলিয়া লইয়া অতসী বলিল,—এ কার ফোটো ?

ও কি ? ওটা কোথায় পেলে ?

হুঁ, আমি কিছু জানিনে, সব দাদার খেয়াল ! দাঁড়াও একবার, সবাইকে দেখিয়ে আনি।

কর কি অতু ? তোমার পায়ে পড়ি, কাউকে দেখিও না, দাও আমাকে—দাও। সত্যি বলছি, আমি কিছুতেই রাজি হইনি, শেষে তোমার দাদা রাগ করতে লাগ্‌ল, কি করি বল ?

আচ্ছা, কাউকে দেখাব না, কিন্তু এখানা আমার কাছে থাক্‌বে।

না, আমাকে দাও।

তোমার তো আরো রয়েছে, এখানা থাক্‌ আমার কাছে।

কাউকে দেখাবে না তো ?

না—না।

ইহার পর হইতে যখনই কোন বিষয়ে অমিয়ার সহিত অতসীর মতভেদ হয়, তখনই অতসী তাহার ফোটো সকলকে দেখাইয়া দিবে বলিয়া ভয় দেখায়, আর অমিয়াও তখনি পরাজয় স্বীকার করে। মোট কথা ঐ ফোটো দিয়া অতসী তাহার বৌদিকে জয় করিয়া ফেলিয়াছে।

৭

অতু, দাদা, বৌদি খাইতে বসিয়াছে। দার্জিলিঙের গল্প হইতেছে। অতসী বলিল,—ওখানে খুব কপি আর কড়াইশুটি পাওয়া যায়, না?

হ্যাঁ, বাজারে কপি আর কড়াইশুটির পাহাড়—সেখানে ওসব গরুতে খায়।

বৌ। আর পাহাড়ের গায়ে রাশ রাশ থলকুড়ি। ভেবেছিলাম মার জন্য এক ঝুড়ি নিয়ে আস্‌ব। শেষে আর হয়ে উঠ্‌ল না।

দা। থলকুড়ি নয়, থানকুনি।

বৌ। থানকুনি নয়, থলকুড়ি।

অ। না, থানকুনি।

বৌ। না, থলকুড়ি।

অ। বটে! তাহলে—কেমন!

বৌ। না, ভাই, তাহলে থানকুনি।

দা। কিরে অতু, তোর বৌদি যে একেবারে কেঁচো—কি করে বশ্‌ কর্‌লি?

অ। আমি একটা শিকড় পেয়েছি, আমার বাক্সে আছে, তাতেই ও বশ হয়েছে।

দা। আমাকে দে না, দেখি, আমি বশ কর্‌তে পারি কি না।

অ। সে শিকড়ে তোমার কোন কাজ হবে না। আচ্ছা, দাদা, সেখানকার মেয়েরা ঘোড়ায় চড়ে?

দা। ওখানকার মেয়েরা তো চড়েই, তাছাড়া মেমরাও চড়ে।

অ। বাঙালী মেয়েরা চড়ে?

অমিয়া অতসীকে খুব জোরে চিমটি কাটিল। অতসীর সেদিকে

ভ্রূক্ষেপ নাই। ওদিকে দাদা মহাশয় একটা ভীষণ বিষম খাইয়া খক্ খক্ করিয়া কাসিতে আরম্ভ করিলেন। ঘরের ভিতর হইতে মা বলিয়া উঠিলেন, এই অতু, তোর কলকলানির জ্বালায় কেউ খেতেও পার্বে না? ওঠ শিগগির ওখান থেকে।

দাদা ও বৌদি আপাতত নিষ্কৃতি পাইলেন।

মে, ১৯৩৮

চা

রমানাথবাবু অতিশয় ভদ্রপ্রকৃতির লোক। যেমন বিনয়ী তেমনি নম্র ও স্বল্পভাষী। তাঁহার এই ভদ্র প্রকৃতি জন্মার্জিত, চেষ্টাকল্পিত বা অভিসন্ধিপ্রণোদিত নয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কিছুদিন হইতে সকলেই লক্ষ্য করিতেছে, রমানাথবাবুর ব্যবহারে যেন ঈষৎ অভদ্রতার আভাস পাওয়া যাইতেছে। বেশ বুঝা যায়, এই অভদ্রতার অভিনয় তাঁহার স্বকীয় প্রকৃতির সহিত মোটেই খাপ খাইতেছে না। অথচ এই প্রকৃতিবিরুদ্ধ ব্যবহারের কারণ কি তাহাও বোঝা যায় না। ভদ্র রমানাথ কেন অভদ্রীভূত হইলেন, কিরূপে এই অভূতভাব সংঘটিত হইল, তাহারই কারণ অনুসন্ধান করিবার চেষ্টা করা যাইতেছে।

সাত দিন পরে যাহার কাপড় দিবার কথা, সে দশ দিন পরে আসিয়া উপস্থিত হইল। রমানাথ বলিলেন, 'বাবা গুরুচরণ, এত দেরি করলে কি চলে? এক ধোপে ডবল কাপড় ময়লা হ'লে কত অসুবিধে তা তো বোঝ। কাপড় এখন থেকে ঠিকমত দিও।' পরের বারে কাপড় আসিল তেরো দিন পরে। এবার রমানাথ বলিলেন, 'দেখ গুরো, সাত দিনে যদি কাপড় দিতে না পারিস, তা হ'লে আর কাপড় নিয়ে কাজ নেই। তোর পাওনা দাম হিসেব ক'রে রেখেছি, নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যা।' এর পর প্রতি রবিবার বৈকালে রমানাথের রজকদর্শন হইতে লাগিল।

দশটা পাঁচটা আপিস। টালিগঞ্জ হইতে ডালহৌসী স্কোয়ার, সময়ও কম লাগে না। কাজেই সকালে মাছের ঝোল খাওয়া আর

হইয়া উঠে না। চাকর রামচরণকে ডাকিয়া বলিলেন, 'রামচরণ, তোর জন্য তো আমায় দেখছি একেবারে নিরামিষাশী হতে হ'ল একটু যদি তাড়াতাড়ি বাজার থেকে আসিস, তা হ'লে মাছের ঝোল না হোক্, অন্তত মাছভাজাটাও খেয়ে যেতে পারি।' পরদিন রামচরণ যখন বাজার হইতে আসিল, তখন রমানাথ ট্রামে উঠিতেছেন; অন্যদিন তিরস্কার করিবার সময় থাকিত, আজ তাহাও রহিল না। পরদিন বাজারে যাইবার সময়ে রামচরণকে বলিলেন, 'দেখ রামা, এই তোর মাইনে হিসেব করা রইল, সাড়ে আটটার পর যদি এক মিনিট দেরি হয়, তবে বাড়ি ঢুকতে পাবি না।' রামা সওয়া আটটার সময়ে বাজার করিয়া ফিরিয়াছে।

রমানাথ একটা ঘড়ি মেরামত করিতে দিয়াছিলেন, পনরো দিন পরে দিবার কথা। তিন সপ্তাহ পরে দোকানদার বলিল, 'আরও এক সপ্তাহ লাগবে।' এক সপ্তাহ পরে পুনরায় রমানাথকে শুনিতে হইল, আর পনরো দিন, কারণ ভাল রেগুলেট করা হয় নাই। রমানাথ যতই ট্রামভাড়া দিয়া অনুনয় বিনয় করিয়া আসেন, ততই বিলম্ব হইতে থাকে। পরে নিরুপায় হইয়া এক উকিল-বন্ধুর নিকট হইতে একখানি চিঠি পাঠাইয়া দিলেন। পরদিন সকালে ঐ দোকানের এক ব্যক্তি ঘড়ি লইয়া রমানাথের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বলিল, 'আপনার ঘড়ি তো অনেক দিন হ'ল হয়ে গেছে, একটু রেগুলেট করতে যা বাকি ছিল, এই নিন আপনার ঘড়ি। মাঝে মাঝে কাজ-টাজ দেবেন। নমস্কার।'

পুরাতন বন্ধু, দশ বৎসর পরে দেখা। বলিলেন, 'বড় দায়ে প'ড়ে এসেছি, হাজার খানেক টাকা এখনই চাই।' রমানাথ বলিলেন, 'সবই তো বুঝছি; এই মেয়ের বিয়েতে আমি একপ্রকার সর্বস্বান্ত হয়েছি। দেখি কি করতে পারি।' বাড়ির ভিতরে গিয়া অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া

অবশেষে একখানা লাইফ-ইন্‌সিওরেন্সের পলিসি বাঁধা দিয়া টাকাটা সংগ্রহ করাই স্থির করিলেন। বন্ধু তৃপ্ত হইলেন। তিন বৎসর হইয়া গিয়াছে, বন্ধুর আর সাক্ষাৎ নাই। একবার সুদের টাকাটা দিয়াছিলেন, পরে তাহাও দেন নাই। সেদিন রমানাথের ভ্রাতুষ্পুত্র পাঁচটি টাকা চাহিতে আসিয়া বিষম ধমক খাইয়াছে। বিনা রসিদে যিনি বন্ধুকে এক হাজার টাকা দিয়া দিলেন, তিনি পাঁচটা টাকা দিতে কেন বিমুখ, তাহা বুঝিতে না পারিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রটি কাকামহাশয়ের মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া উঠিল।

প্রতিবেশী মহিমবাবু ইলেক্‌শনে দাঁড়াইয়াছেন। রমানাথ নিজের গাড়িখানা তাঁহাকে ধার দিলেন এক মাসের জন্য। একমাস পরে ক্ষতবিক্ষত গাড়ি গ্যারেজে ফিরিল। পাড়ারই আর এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা। তিনি বলিলেন, 'কি রমানাথবাবু, খুব কাপ্তেনি কচ্ছেন যে!' রমানাথ সবিস্ময়ে বলিলেন, 'মানে?' বন্ধু বলিলেন, 'মানে আমি কি জানি? যাঁকে গাড়ি দিয়েছিলেন, তিনিই তো বললেন, একটা হাঁদা কাপ্তেন পেয়েছিলুম ভাই, নইলে ট্যাক্সিতে তিনশো টাকা বেরিয়ে যেত!' রমানাথ নির্বাক হইয়া ভাবিলেন, হাঁদা কাপ্তেনই বটে! ইহার পর রমানাথ কাহাকেও গাড়ি ধার দেন নাই, কেহ কেহ এজন্য তাঁহাকে অভদ্র বলিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই।

রমেশ দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়ের ছেলে। কোন কাজকর্ম নাই, রমানাথকে ধরিয়া বসিল, একটা কিছু জোগাড় করিয়া দিতে হইবে। অনেক বলিয়া কহিয়া অনেক চেষ্টা করিয়া রমানাথ নিজেরই আপিসে রমেশকে ঢুকাইয়া দিলেন। যতদিন প্রোবেশনে ছিল, রমেশ সর্বদাই রমানাথের নিকট তাহার অকপট কৃতজ্ঞতা জানাইত। যেদিন রমেশ স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হইল, তার পরদিন হইতে রমানাথের সহিত সাক্ষাৎ

এবং বাক্যালাপ বন্ধ করিল। রমানাথ কিছুদিন পর্যন্ত কারণ স্থির করিতে পারিলেন না, নিজের কোন ত্রুটি হইয়াছে মনে করিয়া অনেক ভাবিয়া দেখিলেন, কিন্তু কিছুই মনে করিতে পারিলেন না। কয়েক-দিন পরে আপিসের বড়বাবুর কথায় রমেশের ব্যবহার স্পষ্টই বুঝা গেল, রমেশ রমানাথকে সরাইয়া তৎস্থলে নিজে বসিতে চায়।

দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর ক্রমাগত ভদ্রতার এইরূপ বিপরীত পরিণাম দেখিয়া দেখিয়া রমানাথের অন্তরাত্মা ব্যথিত হইয়া উঠিল। রমানাথের একটি গুরু ছিলেন, যেমন সকলেরই থাকে। তিনি নারিকেলডাঙার নিবিড় অরণ্যে ত্রিতল ইষ্টককুটীরে শুধু আধ হাত পুরু গালিচার উপর তাকিয়া মাত্র অবলম্বন করিয়া অহোরাত্র কৃচ্ছ্রসাধন করেন। মানসিক ব্যাধির চিকিৎসাবিশারদ এই গুরুদেবের নিকট গিয়া রমানাথ সসম্ভ্রমে বলিলেন, 'বড়ই সমস্যায় পড়িয়াছি।'

'কি হইয়াছে, খুলিয়া বল।'

'যখনই কাহার সহিত ভদ্র ব্যবহার করি, তখনই তাহার নিকট হইতে অভদ্র ব্যবহার প্রাপ্ত হই, ইহার কারণ কি গুরুদেব?'

'ও, এই কথা! দেখ, সব ক্ষেত্রেরই পাত্রাপাত্র বিচার আবশ্যক। তোমার বাক্য এবং তোমার মনের অবস্থা হইতে ইহাই অনুমিত হয় যে, তুমি ভদ্রতা প্রদর্শন বিষয়ে পাত্রাপাত্র বিচার কর নাই। তাহা ছাড়া একটি সাধারণ নিয়ম মনে রাখিবে যে, যথাসাধ্য ভদ্রতা পরিহার করিয়া চলাই কর্তব্য। জগৎ ভদ্রতা চাহে না। ওটা নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক এবং অবান্তর। শাস্ত্রে, পুরাণে এবং অন্যান্য প্রামাণ্য গ্রন্থেও ইহাই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে, ভদ্রতা নিষ্প্রয়োজন, বাহুল্য মাত্র। শুধু তাহাই নহে, ভদ্রতা একপ্রকার দৌর্বল্য, ক্লৈব্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভদ্রতা বিনয়ং লজ্জা দৌর্বল্যং ক্লৈব্যমেবচ—ইত্যমরঃ।

গীতায় পড়িয়াছ, অর্জুন আত্মীয়স্বজনের প্রতি ভদ্রতা করিয়া যুদ্ধ করিতে চাহিতেছেন না, শ্রীকৃষ্ণ তাই বলিতেছেন যে, এ ভদ্রতা ক্লৈব্য, ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্বল্য। গীতায় কেহ খুঁজিয়াছেন কর্মযোগ, কেহ ভক্তি-যোগ, কেহ জ্ঞানযোগ; কেহ অদ্বৈতবাদ, কেহ দ্বৈতবাদ আবার কেহ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ; কিন্তু গীতার প্রকৃত মর্ম কেহই ধরিতে পারেন নাই। গীতার একমাত্র উপদেশ এই যে, ভদ্রতা করিও না। অন্ততঃ পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া সর্বত্র সকলের সহিত ভদ্রতা কখনই করিবে না। কন্যার সহিত ভদ্রতা করা যাইতে পারে, কিন্তু জামাতার সহিত অনাবশ্যক। কন্যার শ্বশুরের সহিত যথাসাধ্য ভদ্রতা করিবে। কিন্তু পুত্রের শ্বশুরের সহিত অভদ্রতাই বিধেয়। থার্ডক্লাসের কামরায় উঠিয়া কোন উড়িয়ার সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাহার সহিত ভদ্রতা করা কর্তব্য নহে, কিন্তু যদি একটি কাবুলিওয়ালার সহিত সাক্ষাৎ হয়, তাহা হইলে ভদ্রতাই বাঞ্ছনীয়। উত্তমর্ণের সহিত ভদ্রতা অবশ্যকর্তব্য, কিন্তু অধমর্ণের সহিত নহে। উপরিতন কর্মচারীর সহিত ভদ্রতা বিধেয়, কিন্তু সহকর্মী বা অধস্তন কর্ম্মচারীর সহিত ভদ্রতা অবিধেয়। এ সকল স্থলে স্থুল নিয়ম এই যে, যাহার নিকট অনিষ্টাশঙ্কা আছে, তাহার সহিত ভদ্রতা এবং তদ্ব্যতীত সর্বত্র অভদ্রতাই সমীচীন। দৃষ্টান্ত আর কত দিব? আশা করি, আমার বক্তব্য তুমি বুঝিতে পারিয়াছ।'

'গুরুদেব, আপনার কথার মর্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি, কিন্তু অনেক সময়ে সংস্কারে বাধে।'

'সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয়। সংস্কারের উপরে উঠিতে সাধনা আবশ্যক। এখন হইতে যত্নবান্ হও, শীঘ্রই অভদ্র হইয়া উঠিতে পারিবে।'

রমানাথের আপাত-অভদ্রীভাবের সম্ভবত ইহাই গূঢ় কারণ।

জুন, ১৯৩৮

হাইজিন

১

আপিসের বেলা হইয়াছে। স্টিফ কলারের মধ্যে টাই লইয়া টানাটানি করিতেছি, এমন সময় গৃহিণী বলিলেন, খোকার জ্বর হয়েছে।

হুঁ।

হুঁ মানে? খোকার জ্বর হয়েছে বল্‌ছি, তা গ্রাহ্যই হ'ল না।

আমি কি অস্বীকার কর্‌ছি?

ডাক্তার ডাক্‌বে না?

আজকের দিনটা দেখ। জ্বর কতটা হয়, অন্যান্য উপসর্গ কি হয়, একটা দিন দেখা যাক—

কি খাবে? বার্লি একেবারেই খেতে চায় না।

একটু দুধ মিশিয়ে দিও। আর দেখ, ঐ জান্‌লা দুটো বন্ধ করে দাও তো। অত হাওয়া লাগিও না।

রোগীর ঘরের জান্‌লা বন্ধ করা ভাল নয়।

তাই বলে অত বাতাস লাগান কি ভাল?

জান্‌লা বন্ধ করলে ওর নিশ্বাসে অক্সিজেনের টানাটানি পড়বে।

এ ঘরে যে অক্সিজেন আছে, তাতে তোমার খোকার এক মাস অন্তত চলবে। তা ছাড়া দরজাগুলো তো খোলাই আছে।

জান্‌লা বন্ধ করা তোমার এক বাই। মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে দেখেছ—অত প্রকাণ্ড ঘর, তবু প্রকাণ্ড জান্‌লাগুলো সব খুলে রাখে।

তা রাখে, কিন্তু সেখানে জ্বরের রোগীর গায়ে ভাল করে জামা বা চাদর জড়ান থাকে। তোমার খোকাটি ত কই মাছের মত লাফাচ্ছে, একবার ঘামছে, একবার চাদর ছুঁড়ে ফেল্‌ছে—এ অবস্থায় বেশী টানা হাওয়া লাগলে আবার অন্য উপসর্গ এসে জুটবে।

আমি হাইজিনে পড়েছি—

আবার হাইজিন—

হ্যাঁ, বি. টি-তে আমার হাইজিন স্পেশাল ছিল। আমাদের টেক্‌স্‌টে ছিল, চতুষ্কোণ চক্রবর্তীর শিশু-হাইজিন। তার চতুর্থ অধ্যায়ে আছে, রোগীর ঘরের জানলা কখনো বন্ধ করিও না।

চতুষ্কোণ চক্রবর্তী? মানুষের নাম?

হ্যাঁ, চারটি বিষয়ে সমান জ্ঞান ছিল বলে তাঁর ওই নাম।

নামটা কি তিনি নিজে রেখেছিলেন?

খুব সম্ভব। এই দেখনা, আমার নাম ছিল কালিদাসী, ম্যাট্রিক পাশ করবার পর বদলে রমলা করে নিলুম।

তা বেশ করেছ। জান্‌লাগুলো আমিই বন্ধ করে দিচ্ছি—এখন চল্‌লুম। বিকেলে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে।

জানালা বন্ধ করিয়া ঘর হইতে বাহির হইলাম। বি. টি.-গৃহিণী জানালাগুলি খুলিয়া দিলেন। আমি তাড়াতাড়ি গিয়া ট্রাম ধরিলাম।

২

আপিস হইতে ফিরিয়াছি। স্টিফ কলারের মধ্য হইতে টাই টানিয়া বাহির করিতেছি, এমন সময়ে গৃহিণী বলিলেন, খোকার জ্বর বেড়েছে।

ও!

ও মানে? বল্‌ছি খোকার জ্বর বেড়েছে, তা গ্রাহ্যই হচ্ছে না!

ভাইড্ চতুষ্কোণ চক্রবর্তী—শিশু-হাইজিন—চাপটার ফোর।

খালি ঠাট্টা! খোকা শুধু আমার, তোমার তো কেউ নয়!

কি বিপদ! আমি এখুনি যাচ্ছি ডাক্তার ডাকৃতে—তুমি অত ব্যস্ত হয়ো না।

তোমার ভরসায় আমি বসে আছি কি না! ডাক্তার আমি ডেকেছিলুম।

কাকে?

ডাক্তার ভাদুড়ীকে।

ডাক্তার ভাদুড়ী? তিনি কে? আমাদের বোস্‌কে ডাকলেই হত।

ডাক্তার ভাদুড়ী সম্প্রতি বিলেত থেকে এল্. আর. সি. পি. পাশ করে এসেছেন—আবার যাবেন।

ও।

আমি যখন বি. টি. পড়ি, উনি তখন এম্. বি. পড়তেন; আমি যেবার বি. টি.-তে ফেল হই, উনি সেবার এম্. বি.-তে ফেল হন; আমি যেবার বি. টি. পাশ করি, উনি সেবার এম্. বি. পাশ করেন; আমার যখন বিয়ে হ'ল, উনি তখন বিলেত গেলেন।

হুঁ।

হুঁ মানে?

খোকার অসুখের খবর পেয়ে বিলেত থেকে দেখতে এসেছেন বুঝি?

দেখ, তোমার ঠাট্টার জ্বালায় আমার গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে করে।

খোকার অসুখটা সারুক, তার পর যা হয় করো। তা' ডাক্তার কি বল্লে?

বল্লে, ভয়ের কিছু নেই, সাধারণ ফ্লু বলেই মনে হচ্ছে, বুকটা ভাল করে ঢেকে রাখবেন।

তোমার হাইজিন সম্বন্ধে একটা বক্তৃতা করেছো তো? চতুষ্কোণ—যাও!

৩

স্টিফ কলারের মধ্যে টাই টানিতেছি, গৃহিণী বলিলেন, ডাক্তার ভাদুড়ীকে আজ রাত্রে খেতে বলেছি। বলা বাহুল্য, আমার টাই বাঁধিবার সময়টাই গৃহিণীর গার্হস্থ্য-সমাচার-প্রদানের প্রকৃষ্ট সময়।

কবে বল্লে? আমি ত জানিনে কিছু।

এই ত জান্‌লে।

ও। আমাকেও কি তাঁর সঙ্গে খেতে হবে?

মানে?

মানে, আমার নিমন্ত্রণ আছে কি না, জান্‌তে চাইছি।

ফের ইয়ে? দেখ, আপিস থেকে ফেরবার পথে কিছু হিমাদ্রি সন্দেশ নিয়ে এসো।

আচ্ছা।

আপিস হইতে ফিরিয়া দেখি, শ্যালিকা অরুণাও নিমন্ত্রিতা। কেমন যেন একটা ষড়যন্ত্রের আভাস পাইলাম। যাক্, যথাসময়ে টেবিলে বসা গেল। কাহারও সহিত কাহারও পরিচয় করাইয়া দিবার প্রয়োজন হইল না। দেখিলাম ডাক্তার ভাদুড়ী অরুণাকেও চেনেন।

কয়েকটি পদ খাওয়ার পর দেখিলাম, তরল পদার্থগুলির স্বাদ প্রায় জলের মত এবং কঠিন পদার্থগুলির স্বাদ অনেকটা নারিকেলের ছোবড়ার মত হইয়াছে। গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কে রেঁধেছে?

বয়ই বেঁধেছে, তবে আজ আমি নিজে দেখিয়ে দিয়েছি।

ও।

ও মানে ?

মানে কিছুই না। আস্বাদটা ঠিক ধরতে পারছিনে।

কোন রান্নাতেই তেল, ঘি, মাখন ইত্যাদি কিছুই ব্যবহার করিনি।

কেন ?

উনুনের উপর চড়ালেই ওগুলোর ভাইটামিন নষ্ট হয়ে যায়।

ও।

আচ্ছা আপনিই বলুন, ডাক্তার ভাদুড়ী, ঠিক কি না।

হ্যাঁ, তা কতকটা ঠিক বই কি।

কি বলিস্, অরুণা, তুই ত হাইজিন পড়েছিস্।

কেবল আরম্ভ করেছি, এখনো ভাইটামিন পর্যন্ত পৌঁছই নি।

বয়ের পরিবেষণ শেষ হইয়া আসিল। অরুণার হোস্টেলের গল্প, ডাক্তার ভাদুড়ীর লণ্ডনের গল্পের সঙ্গে বেশ যেন জলের সঙ্গে চিনির মত মিশিয়া যাইতে লাগিল।

বয়কে বলিলাম, দই আর সন্দেশ নিয়ে এস। দই সন্দেশ সকলেই খুব তৃপ্তির সঙ্গেই খাইলেন। হাইজিন-সম্মত রান্না খাইয়া অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইবার পর একটু দই ও সন্দেশ খাইয়া সকলেই যেন বহু-আকাঙ্খিত বিশ্রাম লাভ করিলেন।

খাওয়া শেষ হইয়াছে। সকলেরই সাম্‌নে এক কাপ কফি। ডাক্তার ভাদুড়ী একটি সিগারেট ধরাইয়াছেন।

গৃহিণী একটু সাগ্রহেই জিজ্ঞাসা করিলেন, রান্নাগুলো কেমন হয়েছে, খাওয়ার মত হয়েছিল তো ?

ডাক্তার ভাদুড়ী বলিলেন, নিশ্চয়ই, খাসা। অরুণা, তুমিও শিখে

রেথ। আমাদের রান্নাগুলোকে ক্রমে ক্রমে হাইজিন-সম্মত করে তুল্‌তে হবে। এবং তোমাদের মত মেয়েরাই একাজে অগ্রণী হবে।

অরুণা একটু সলজ্জ হাসির সহিত বলিল, নিশ্চয়ই।

৪

দেড় বৎসর পরের কথা।

১১২ নং গাওয়ার স্ট্রীট, লণ্ডন। ডাঃ ভাদুড়ী এবং মিসেস ভাদুড়ী (অর্থাৎ অরুণা) রেস্তোরাঁয় ঢুকিলেন। বিশেষ কেহ লক্ষ্য করিল বলিয়া মনে হইল না। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যাহাই হউক, সামাজিক ক্ষেত্রে বিলাতে ভারতীয় নারীর মত করুণ দৃশ্য আর আছে কি না সন্দেহ। কলেজের গাড়ীতে বসিয়া এবং হোস্টেলের বারান্দায় দাঁড়াইয়া যে সব বখাটে ছোকরাকে অরুণা অত্যন্ত অভদ্র এবং বিরক্তিকর বলিয়া মনে করিত, এখানে আসিয়া তাহারাও যেন মনে মনে একটু বাঞ্ছনীয় হইয়া উঠিল—বখাটে হউক আর অভদ্রই হউক, তবু তো একবার চাহিয়া দেখিত!

সপ্তাহ ভরিয়া হাইজিন-সম্মত রান্না খাইয়া ভাদুড়ীদম্পতী গাওয়ার স্ট্রীটে আসিয়া তৈল-ঘৃত-হলুদ-লঙ্কা-মসলা দিয়া রাঁধা পোলাও, মাংস, ডাল, চাটনি প্রভৃতি দ্বারা মুখ বদ্‌লাইতেন। টেবিলে বসিয়া ডাঃ ভাদুড়ী বলিলেন, এত ঝাল-মসলা খাওয়া ভাল নয়।

তা না হোক্। মুখের স্বাদ বলে তো একটা জিনিস আছে।

যাই বল, এদের রান্না বেশ হাইজিন-সম্মত। তোমার দিদি হ'লে খুব পছন্দ করতেন।

দিদি কি পছন্দ করতেন বা না করতেন, সে কথা রোজ দশবার ক'রে আমাকে না শোনালেই ভাল হয়।

কথাবার্তা বেশী অগ্রসর হইল না। ডিনার শেষ করিয়া দাম ও টিপ চুকাইয়া তাঁহারা বাহির হইয়া পড়িলেন এবং ওভারকোটের কলার উল্টাইয়া চাপিয়া ধরিয়া ঝুরঝুরে বরফের বৃষ্টির মধ্যেই নিজেদের ফ্ল্যাটে ফিরিয়া গেলেন।

৫

আরো ছয়মাস পরে।

শনিবার। সন্ধ্যা। শরীরটা ভাল লাগিতেছে না। ইজি উপর চুপচাপ পড়িয়া আছি। বয় একখানা চিঠি দিয়া গেল। বিলাতের চিঠি, সাগ্রহে খুলিলাম। দুখানি চিঠি, একখানা আমার, আর একখানা গৃহিণীর। গৃহিণীকে ডাকিয়া তাঁহার চিঠি তাঁহাকে দিয়া বলিলাম, চিঠিখানা চেঁচিয়ে পড়—আমি শুন্‌ব।

তুমিও তাহলে তোমার চিঠি চেঁচিয়ে পড়্‌বে, আমি শুন্‌ব।

আচ্ছা পড়্‌ব। আগে তুমি পড়।

গৃহিণী পড়িতে লাগিলেন, ডিয়ার মিসেস চ্যাটার্জি, দিনগুলি বেশ কাটছে। পড়াশুনা আর অরুণা আমার জীবনটাকে ভরে রেখেছে। এবারই এম্. আর. সি. এস্-টা দেব। খাসা জলবায়ু, খুব পরিশ্রম করা যায়। আহারাদির ব্যবস্থাও খুব হাইজিন-সম্মত—খেতে বস্‌লেই আপনার কথা মনে পড়ে। একবার আসুন না—কিছুদিনের জন্য বেড়িয়ে যাবেন। এদের সমাজও আমাকে মুগ্ধ করেছে—কি উৎসাহ, কি প্রাণ, কি পুলক! আমি তো ভাবছি, পাশ করে এখানেই একটা প্যানেল যোগাড় করে প্র্যাকটিস্ আরম্ভ কর্‌ব। কি বলেন? আজ ইতি। আপনাদের ভাদুড়ী।

চিঠি শেষ করিয়া গৃহিণী বলিলেন, চল্ না, একবার ঘুরে আসি।

সে দেখা যাবে'খন। এইবার অরুণার চিঠি শোন—জামাইবাবু, অনেকদিন পরে আপনাকে চিঠি লিখছি। চিঠি পত্র লিখতে আমার ইচ্ছে করে না—মোট কথা কোন কাজই আমার করতে ইচ্ছে করে না। এখানে এসে অবধি আমার যেন কি হয়েছে। কিছুই ভাল লাগে না। দুরন্ত শীত, চব্বিশ ঘণ্টা কাপড় চোপড় আঁটতে আঁটতে প্রাণান্ত। রোদের নামগন্ধ নেই, দিনরাত পৃথিবীটা যেন গুম্‌রে গুম্‌রে কাঁদ্‌ছে। সেই গ্রীষ্মের দুটো মাস বাদ দিলে এদেশটা যেন একটা প্রকাণ্ড জেলখানা —কোথাও বেরুবার জো নেই—সব ঘরের মধ্যে। দিবারাত্র আগুন কোলে ক'রে বসে থাকৃতে কার ভাল লাগে বলুন তো? তারপর, আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব কেউ নেই বল্‌লেই হয়।

খাওয়ার কথা মনে হলেই আমার কান্না পায়, জামাই বাবু! এখানে এসে অবধি একদিনও তৃপ্তির সঙ্গে পেট ভরে খাইনি। দেখুন, হাস্‌বেন না কিন্তু, যদি পারেন তো এয়ার-টাইট কৌটায় করে খানকয়েক ইলিশ মাছ ভাজা আর একটু কচি আমের অম্বল পাঠিয়ে দিতে পারেন? এখানকার হাইজিন-সম্মত রান্না খেয়ে তো আর পারিনে! বলদের লেজের ঝোল, ষাঁড়ের ঝুটি, বলদের জিভ্, শূয়রের পাছা, ভেড়ার ঘিলু—সব সিদ্ধ না হয় চর্বিতে সাঁতলান; নাড়ী ভুড়ির চচ্চড়ি; পাঁচ মিশেলি মাংসের ঘণ্ট; আলু, গাজর আর বরবটি সিদ্ধ, তাতে না আছে তেল-ঘি, না আছে হলুদ-লঙ্কা, না আছে জিরে-মরিচ। আমাদের দেশের শুধু ভাতও এসবের চেয়ে ভাল। কতদিনে যে এ পাপের শান্তি হবে, তা জানিনে!

দেশে থাকৃতে এদের সমাজের কতই না প্রশংসা শুনেছি। কি দেখে যে লোকে ভোলে, তা তো বুঝিনে। নেহাত টাকা পায়, তাই খেতে দেয়! আর মেয়েগুলো, ব্বাপস্, যেমন অসভ্য, তেমনি বেহায়া!

তাদের কথা চিঠিতে লেখাও যায় না। আমার তো এক একবার মনে হয়, এখুনি দেশে ফিরে যাই, কিন্তু এ ডাইনীদের কাছে ওঁকে রেখে যেতে মন সরে না। যেদিন ওঁর পরীক্ষা শেষ হবে, সেই দিনই রওনা হ'ব, তারপর আর এক মুহূর্তও না।

আপনারা একবার এ হাইজিনিক দেশটা দেখে যান না। দিদি খুব খুসী হবেন। নমস্কার জান্‌বেন। খোকাকে স্নেহাশীষ দেবেন। ইতি অরুণা।

চিঠি শেষ করিয়া গৃহিণীকে বলিলাম, কেমন, যাবে?

যাব। ওখান থেকে একটা হাইজিনের ডিপ্লোমা নিয়ে আস্‌ব।

মার্চ, ১৯৩৮

স্ব-চালিত গাড়ী

১

গৃহিণী বলিলেন, 'হয় ড্রাইভার রাখ, না হয় গাড়ী বেচে ফেল।'

'আবার ঐ এক কথা! নিজে গাড়ী চালালে কত সুবিধে!—ড্রাইভারের মাইনে দিতে হয় না; তেল পেট্রলের হিসেব রাখ্‌তে হয় না; গাড়ীর কলকব্জা ভাল থাকে; তা ছাড়া গাড়ী চালাতেও একটা আনন্দ আছে।'

'তা থাক্‌। রোজ কাগজে দেখি, কত অ্যাক্‌সিডেন্ট্‌ হচ্ছে। ভয় করে না?

'অ্যাক্‌সিডেন্ট্‌ তো ড্রাইভার থাক্‌লেও হতে পারে!'

'কিন্তু সম্ভাবনা কম। তারা বেশি সাবধান। কোন গাড়ী একটু আগে যেতে দেখলেই তারা ক্ষেপে যায় না; তারা গাড়ী চালাতে বসে ক্যাণ্ট আর হেগেল নিয়ে মাথা ঘামায় না, কিংবা শাড়ীর স্টক ভবানীপুরে বেশি না কলেজ স্ট্রীটে বেশি তা নিয়ে তর্কাতর্কি করে না। তোমার সঙ্গে গাড়ীতে বেরুলেই আমার মনটা ধুক্‌ ধুক্‌ করে।'

'আমাদের দেশেই অত ড্রাইভারের ছড়াছড়ি। বিলেতে কয়জনে ড্রাইভার রাখে? নেহাত আমীর-ওমরা ছাড়া আর কেউ না। আমাদের সব বিষয়েই বাড়াবাড়ি। একশ টাকা যার আয় তার তিনটে ঝি-চাকর, আর বিলেতে হাজার টাকা যার মাইনে, সেও একটা ঠিকা ঝি ছাড়া আর কোন লোক রাখে না।'

'ফের বিলেত! বিলেতের এ ভাল, বিলেতের তা ভাল; বিলেতের সবই যদি ভাল, তা হলে—'

'থাক্, আর তর্কে কাজ নেই। চট্‌পট্ সেরে নাও তো! সাড়ে পাঁচটা বেজে গেল।'

'তা তো নিচ্ছি! এদিকে রামাটা সেই যে বেরিয়েছে, আর খোঁজ নেই। সে না এলে বাড়ীতে থাক্‌বে কে? সেজদির চাকরটা কেমন ভাল, এক পাও বাড়ী থেকে নড়ে না; তাঁর ঠাকুরটাও খাসা রাঁধে!'

'ফের সেজদি! সেজদির এ ভাল, সেজদির তা ভাল; সেজদির যদি সবই ভাল, তাহলে—'

'হয়েছে, এখন বেরোও ত দেখি। সব নিয়েছ তো—চাবি, ড্রাইভিং লাইসেন্স্?'

২

সিনেমার সম্মুখে গিয়া দেখি, ভয়ানক ভীড়। থামিতেই একটি কন্‌স্টেব্‌ল বলিল, 'আগে বাঢ়াইয়ে বাবু'। একটু সাম্‌নে গিয়া দেখি, 'নো পার্কিং'। আর একটু সরিয়া যাইতেই পিছন হইতে একখানা দোতলা বাস্ হুঙ্কার দিয়া উঠিল; সম্মুখে বাস্-স্টপ। আরও খানিক সরিয়া যাইতেই একটি রাস্তার মোড়ে আসিয়া পড়িলাম। মোড় পার হইয়াই দেখি, পর পর রিক্‌স, গরুর গাড়ী এবং ঘোড়ার গাড়ী সারি দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সেগুলিও পার হইয়া অতি কষ্টে একটি স্থান পাওয়া গেল। গাড়ী রাখিয়া সিনেমায় ঢুকিলাম, কিন্তু মনের একচতুর্থাংশ গাড়ীতেই পড়িয়া রহিল। মন ভাবিতে পারে, চোর তাড়াইতে পারে না। ফিরিবার সময় দেখা গেল, রেডিয়েটর ক্যাপ এবং টেল-ল্যাম্পটি অন্তর্হিত হইয়াছে।

গৃহিণী বলিলেন, 'এই জন্যেই তো ড্রাইভার রাখতে বলি।'

'একটি ক্যাপ এবং একটি ল্যাম্পের দাম হয়ত পাঁচ-সাত টাকা। আর একটি ড্রাইভারের মাইনে মাসে চল্লিশ টাকা।

'এর পরে দেখো, একদিন চল্লিশ দুগুণে আশি টাকার জিনিষ চুরি যাবে। ভাল কথা—তোমার A. A. B'এর খবর কি? তারা নাকি গাড়ী পাহারা দেয়?'

'দেয় তো, কিন্তু সব জায়গায় নয়।'

'ও! নাও, এখন চল।'

গাড়ী চলিল। গৃহিণী বলিলেন, 'গোপেন মল্লিকের অ্যাক্‌টিংটা খাসা হয়েছে।'

'কাল একবার মল্লিক-বাজারে যেতে হবে, দেখি একটা সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড্ ক্যাপ বা ল্যাম্প পাই কি না।'

'যাই বল, করুণার অ্যাক্‌টিং তেমন ভাল হয় নাই, কি বিশ্রী গলা!'

'করোনা ল্যাম্পগুলো সস্তা। যদি সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড্ ল্যাম্প না পাই, তা হলে ওরই একটা কিনতে হবে।'

'তোমার ল্যাম্প আর ক্যাপ এখন রাখ।'

'তোমার গোপেন আর করুণা এখন রাখ।'

উভয়েই কিছুক্ষণ নীরব। শোঁ শোঁ বাতাস, তারপর টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি, একটু পরেই ঝুপ্ ঝুপ্, কিছুক্ষণ মধ্যেই মুষলধারা। নামিয়া যে সাইড্‌স্ক্রীনগুলি লাগাইব, সে জো নাই। উইণ্ডস্ক্রীন-ওয়াইপারটা চলে না, কাজেই সামনেরও খানিকটা ফাঁক রাখিতে হইয়াছে। ফলে তিন দিকের জলের ঝাপ্‌টায় দুইজনের প্রায় সমস্ত শরীর ভিজিয়া গেল।

গৃহিণী বলিলেন, 'ঠিক যেন সেই ঝড়ের সীন্‌টা।'

'হ্যাঁ, এর পরের সীনেই দেখা যাবে, গোপেন তুলি দিয়ে করুণার গলায় পেণ্ট লাগাচ্ছে।'

৩

রবিবার। সকালে উঠিয়া দেখি, চারিদিকে 'সাজ সাজ' রব। ব্যাপার কি? গৃহিণীকে একবার সম্মুখে পাইয়া কারণ জিজ্ঞাস করিলাম।

'কেন, মনে নেই, আজ বোটানিক্যাল গার্ডেনে পিক্‌নিক?'

'কিন্তু আমার যে একটু দরকারী কাজ ছিল। তাহলে আজ তোমরাই না হয় যাও।'

'ভাবিতে উচিত ছিল, প্রতিজ্ঞা যখন। গাড়ীরই বা কি হবে? ট্যাক্সিতে গেলে দশ টাকার কমে হবে না। বাসেই না হয় যেতুম, কিন্তু সেজদি বলেছেন, তাঁকে তুলে নিয়ে যেতে।'

'তা তো বুঝলুম, কিন্তু—'

'এই আট দশ মাইল পথ যেতেই যত আপত্তি। যদি কেউ বল্‌ত, চল একবার পাটনা ঘুরে আসি, তাহলে এখনই ছুটতে।'

তর্ক বৃথা। কারণ পিকনিক্‌টা একটা 'সেট্‌ল্‌ড্‌ ফ্যাক্ট্‌'। যথাসময়ে গাড়ী বোঝাই হইল। শতরঞ্চি, স্টোভ, জলের কুঁজো, চায়ের সরঞ্জাম, খাবারের বাস্কেট, তাস, গ্রামোফোন, ক্যামেরা কিছুই বাদ রহিল না। আরো দুইখানা গাড়ী যাইবে। সকলেই বোটানিক্যাল গার্ডেনে 'পদ্ম-পুকুরটার' পাড়ে মিলিত হইব, এইরূপ ব্যবস্থা ছিল।

বলিলাম, 'আরও তো দুখানা গাড়ী যাচ্ছে, জিনিষপত্র এত না নিলেই হত।'

গৃহিণী বলিলেন, 'এ আর বেশী জিনিষ কি? সেবারে একা সেজদিই তো এর ডবল জিনিষ নিয়েছিলেন।'

'এবারেও কি তাই নেবেন নাকি? তা হলে কিন্তু আমি তোমার সেজদির বাড়ী মুখো হচ্ছি নে।'

'ভয় নেই, এবার তিনি একাই যাবেন।'

সেজদির বাড়ীর সম্মুখে গাড়ী থামিল। সেজদি প্রস্তুতই ছিলেন, এক মিনিট পরেই বাহির হইয়া আসিলেন। মনে হইল, তাঁহাকে দেখিয়াই গাড়ীর স্প্রিং চারিখানি ক্যাঁচ ক্যাঁচ করিয়া উঠিল। যাহা হউক, ছেলে-মেয়ে দুটিকে বাস্কেটের উপর বসাইয়া শাকের-আঁটির-উপর বোঝা-স্বরূপিনী সেজদি পিছনের সীটে অধিষ্ঠিত হইলেন। থিওরেমের পার্শ্বে করোলারির মত গৃহিণী একপার্শ্বে একটু স্থান করিয়া লইলেন।

গাড়ী চলিয়াছে। গৃহিণী বলিলেন, 'শুন্‌ছো!'

'কি?'

'শ্যামপুকুর থেকে নীলুকে একটু তুলে নিলে হত না, গাড়ী যখন যাচ্ছেই।'

'বেশ ত!'

নীলুকে আগে সংবাদ দেওয়া হয় নাই। কাজেই দশ মিনিটের কমে সে গাড়ীতে আসিয়া উঠিতে পারিল না। সঙ্গে সঙ্গে তার ছোট তিনটি ভাই বোন আসিয়া কাপড় টানিয়া ধরিল, তাহারাও যাইবে। বলিলাম, 'ওরাও আসুক না।' মহানন্দে তাহারা বাড়ীর ভিতর ফিরিয়া গেল এবং সাজিয়া-গুজিয়া গাড়ীতে উঠিল। কে কোথায় কেমন করিয়া বসিল বা দাঁড়াইয়া রহিল, সে সংবাদ লওয়া প্রয়োজন মনে করিলাম না। গাড়ী ছাড়িলে গৃহিণী বলিলেন, 'মার্কেট থেকে কিছু ফল-টল নিলে হ'ত—বড় ভুল হয়ে গেছে।'

'শ্যামপুকুর থেকে মার্কেট?'

'একটু চলই না, গাড়ী তো আর তোমাকে ঠেল্‌তে হচ্ছে না। এইজন্যই তো বলি, একটা ড্রাইভার রাখ।'

মার্কেট হইতে ফল-টলের সঙ্গে সঙ্গে রুটি, মাখন, ডিম, স্যালাড

প্রভৃতি কতকগুলি প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় খাদ্য সংগৃহীত হইল। ক্যামেরার জন্য একটি ফিল্ম, গ্রামোফোনের জন্য এক কৌটা পিন্ এবং একটা বড় ফ্লাস্কে কিছু বরফও বাদ পড়িল না। এবার সত্যই বোঝাই শেষ হইয়াছে।

বোটানিক্যাল গার্ডেনে পৌঁছিয়া দেখা গেল অন্য দুইখানি গাড়ী বহু পূর্বেই আসিয়াছে এবং প্রকাণ্ড একটা দল হৈ হৈ আরম্ভ করিয়াছে। দুই ঘণ্টা লেট হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিবার জন্য সকলেই গাড়ী ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু গাড়ীর দিকে চাহিয়া আর আমার মৌখিক উত্তরের অপেক্ষা করিলেন না।

৪

পিক্‌নিক্‌টা ভালই জমিল। সেজদি খাবারের চার্জ লইলেন। চায়ের পর্ব শেষ হইলে, দুই দল তাস লইয়া বসিল। দুই দল এদিকে ওদিক ঘুরপাক খাইতে গেল। ছোটদের একদল গ্রামোফোন লইয়া পড়িল। সেজদির দল গল্পগুজবে মন দিলেন।

তার পর ফোটো। একজনে, দুইজনে, তিনজনে, বহুজনে, নানাপ্রকার পারমিউটেশন ও কম্বিনেশন করিয়া ফোটো তোলা হইল। পরে আহারের পালা। আহার শেষ হইলে, বিজয়ের তাসের ম্যাজিক, নরেশের বাঁশী, ছয় বছরের বুলুর কাণোয়াতি, তিন বছরের টুনুর প্রাচ্য নৃত্য, এবং মনীশের হাসির গল্প, কিছুই বাদ গেল না। সুতরাং লীলা এবং সতীশ সম্বন্ধে ঈষৎ কাণাঘুষা সত্বেও সমস্ত দিনের এই অনাবিল আনন্দে সকলেই পরিপূর্ণ মাত্রায় তৃপ্তিলাভ করিলেন।

ফিরিবার সময় হইয়াছে। তিন গাড়ীর যাত্রীদেরও একটু অদলবদল হইয়া গেল। আমাকে আর শ্যামপুকুর যাইতে হইবে না। অন্য

একখানি মোটর উহাদের পৌঁছাইয়া দিবে। কিন্তু তৎপরিবর্তে সেজদির ননদ ও তাহার স্বামীকে বরানগরে পৌঁছাইয়া দিতে হইবে।

শিবপুর বাজার পার হইতেই খোকা বলিল, 'জল খাব'। গাড়ী থামাইয়া জল আনিতে হইল। রামকৃষ্ণপুর আসিতেই সেজদি বলিলেন, 'দুপয়সার পান কিন্‌লে হত। সবাইকে দিয়ে শেষে আমার আর পান খাওয়া হয় নি।' গাড়ী থামিল, সেজদি বলিলেন, 'ঐ সঙ্গে একটু দোক্তা।'

আবার ষ্টার্টার, ক্লাচ, গীয়ার, অ্যাক্‌সিলারেটর—গাড়ী চলিয়াছে। সামনের একখানা বাস্ হঠাৎ ব্রেক দেওয়ায় বাধ্য হইয়া ডান দিকে একটু সরিতে হইল, ফলে একখানা গরুর গাড়ীর সহিত ধাক্কা। মাড্-গার্ডখানি তুবড়াইয়া চাকা আটকাইয়া গেল। নামিলাম, সজোরে টানিয়া কোনমতে চাকাটা আল্‌গা করিয়া তোবড়ান মাড্-গার্ড লইয়াই অগ্রসর হইলাম।

ক্রমাগত ট্রাম, বাস্ ও গরুর গাড়ীর ভীড় ঠেলিয়া হাওড়ার মাঠে আসিয়া একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিব, এমন সময় ভীষণ শব্দ! পঁয়ত্রিশ মাইল স্পীডে সামনের টায়ার ফাটিয়া গেলে ড্রাইভারের কি অবস্থা হয়, তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত আর কেহ কল্পনা করিতে পারিবেন না। নামিয়া গিয়া এদিক ওদিক খুঁজিয়া একজন মিস্ত্রী ডাকিয়া আনিলাম। তাহার সঙ্গে মিলিয়া স্টেপনি খুলিয়া লাগান হইল বটে, কিন্তু দেখা গেল, উহাতে বায়ুর চাপ মাত্র দশ পাউণ্ড। মেয়েদের গাড়ীতে বসাইয়া বাকী কয়জনে মিলিয়া ঠেলিয়াই গাড়ীখানিকে একটা পাম্পের নিকট আনিতে হইল।

বরানগরের যাত্রীরা নিরাপদে বাড়ী ফিরিলেন। সেজদিও যথাস্থানে নামিয়া গেলেন। নামিয়া বলিলেন, 'তোমার খুব কষ্ট হ'ল কিন্তু।'

'কষ্ট আর কি! গাড়ী চালাতে আমার ভালই লাগে।'

'সোজা ফাঁকা রাস্তায় ত ভাল লাগবারই কথা। কিন্তু সহরের মধ্যে বাপু, একটা ড্রাইভার রাখ।'

গৃহিণী বলিয়া উঠিলেন, 'না হয়, গাড়ী বেচে ফেল।'

হাসিয়া বলিলাম, 'আচ্ছা আজ আসি, সেজদি।'

ক্লান্ত যে একটু হইয়াছিলাম, তাহা অস্বীকার করা যায় না। শ্যামবাজারে পৌছিতেই একখানা বাইসাইক্ল্ বামদিকের মাড্-গার্ডটার উপর আসিয়া পড়িল। দোষ অবশ্য সাইক্লিস্টের। কিন্তু কলিকাতায়, শুধু কলিকাতায় কেন সর্বত্রই, মোটরচালকই নন্দঘোষ। ভীড় জমিল, কন্স্টেবল উদিত হইলেন, সাইক্লিস্ট উদারতা দেখাইয়া জানাইলেন যে গোটা পঁচিশ টাকা পাইলেই তিনি সন্তুষ্ট এবং মনে মনে ভাবিলেন, আড়াই টাকা দিয়া সাইকেল সারাইয়া বাকী সাড়ে বাইশ টাকা লইয়া সামনের শনিবারে টালিগঞ্জে গিয়া মোটর গাড়ী কিনিবার উদ্যোগ করিবেন। এ ব্যবস্থা আমার মনঃপূত হইল না, ইহার জন্য প্রস্তুতও ছিলাম না। সুতরাং কন্স্টেবলের নিকট নাম, ধাম, লাইসেন্স-নম্বর প্রভৃতি দিয়া আপাততঃ নিষ্কৃতি লাভ করিলাম।

বাড়ী ফিরিয়া ঈজিচেয়ারে এলাইয়া পড়িয়া চায়ের বাটিতে চুমুক দিতে দিতে হাতলোপবিষ্টা গৃহিণীকে বলিলাম, 'দিনটা বেশ কাট্‌ল।'

'তা তো কাট্‌ল। কিন্তু তোমার বড্ড কষ্ট হয়েছে।'

'এ তো ভারি কষ্ট! বিলেতে এসব কষ্ট কেউ কষ্ট বলেই মনে করে না, মনে করে খেলা।'

'ফের বিলেত! শুধু আমি ত নয়, সেজদিও তো বল্লেন।'

'ফের সেজদি!'

৫

কয়েকদিন পরে লালরঙের একখানি চিঠি আসিল। লীলা এবং সতীশের সম্বন্ধে কাণাঘুষাটা ঢোল এবং সানাই দ্বারা প্রচারিত হইবে। ঘটকী সেজদি। লীলা সেদিন সতীশের মোটরেই বাড়ী ফিরিয়াছিল।

অক্টোবর, ১৯৩৭

হারাধন

১

হারাধন, ওরফে হারু, অল্প বয়সে অত্যন্ত কৃশ ছিল। তাহার মাতাঠাকুরাণী প্রায়ই অনুযোগ করিতেন, ছেলেটা এমন রোগা টিঙটিঙে, একটা ডাক্তার বা কবিরাজ দেখাইলে হয়; ঠাকুমা বলিতেন, ওর গড়নটাই ছিপছিপে, অসুখ-বিসুখ না হইলেই হইল; পাড়ার মেয়েরা স্কুলে যাইবার সময়ে বলাবলি করিত, ছেলেটার কি লিকলিকে চেহারা, ভাই!

পনেরো বৎসর বয়সে হারু জ্বর-গায়ে স্কুল হইতে বাড়ি ফিরিল, আর কোন দিন স্কুলে ফিরিয়া গেল না। কারণ জ্বরটা সারিতে এক মাস লাগিল; তারপর বাড়ির সবাই বলিল, পনেরো বৎসর বয়সে যে ক্লাস সিক্সের উপরে উঠিতে পারে নাই এবং যাহাকে দেখিলে মনে হয়, একটা ফুঁ দিলে পড়িয়া যাইবে, তাহার আর স্কুলে যাইবার দরকার নাই। ঠাকুমা বলিলেন, প্রাণে বাঁচিয়া থাকুক, পড়াশুনার আর দরকার নাই।

অসুখের পর হারুর অস্থি কয়খানি ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট রহিল না। সারাদিন প্রায় শুইয়াই থাকে। খাটের পাশে একটা টেবিল ঔষধের শিশি, মোড়ক এবং প্রেস্‌ক্রিপশনে বোঝাই।

একদিন এক কাণ্ড ঘটিল। হারু শুইয়া শুইয়া একখানা মাসিক পত্রিকার পাতা উল্টাইতেছে; হঠাৎ তাহার দৃষ্টি পড়িল, উহারই এক পৃষ্ঠায় একটি ব্যায়ামবীরের ছবির উপর। দৃষ্টি পড়িতেই তাহার বাসনা হইল, সেও ঐরূপ হইবে। তৎক্ষণাৎ খাটের উপর উঠিয়া বসিল, মাসিক

পত্রিকাখানি বালিশের তলায় রাখিয়া দিল, সমস্ত ঔষধের শিশি, মোড়ক জানালা দিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিল এবং খাটের উপর পাঁচটা ডন এবং দশটা বৈঠক করিয়া ফেলিল। বাড়ির সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইল, একটু ভীতও হইল। কিন্তু হারু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

পরদিনই ডাম্বেল আসিল, মুদ্গার আসিল, বক্ষঃপ্রসারক আসিল। কয়েকদিনের মধ্যেই মাসিক-পত্রিকা-বিজ্ঞাপিত ব্যায়ামবীরের শিষ্যত্ব বরণ করিয়া তাঁহারই উপদেশ এবং তাঁহারই নির্দেশ অনুসারে নিয়মিত ব্যায়াম করিতে আরম্ভ করিল। ক্রমশ শরীরের শ্রী ফিরিয়া আসিল, মাংসহীন দেহে মাংসের সঞ্চার হইল, পেশী দৃঢ় ও স্ফীত হইতে লাগিল এবং সমগ্র দেহ কান্তি ও লাবণ্যে পূর্ণ হইল।

ব্যায়ামের সহিত প্রচুর আহার, উপযুক্ত পথ্য এবং সুনির্বাচিত ঔষধের আবশ্যকতা আছে। শ্রীগুরুর নির্দেশানুসারে হারুর ব্যবস্থা হইল, প্রাতে অরুণোদয় বটিকা, মধ্যাহ্নে প্রচণ্ড-মার্ত্তণ্ড রস, সায়াহ্নে অস্তাচল লৌহ, রাত্রে নিশীথরঙ্গিনী গুড়িকা, এবং প্রতিবার আহারের পূর্বে ষণ্ডামর্ক রসায়ন। ভোজ্যের যাহা ব্যবস্থা হইল, তাহার মধ্যে কুক্কুটনির্যাস, ঘনদুগ্ধ, নবনীত, মৎস্যমুণ্ড, ছাগমস্তিষ্ক এবং অর্ধসিদ্ধ ডিম্ব প্রতিদিনই থাকিত। এতদ্ব্যতীত পথ্য হিসাবে বেদানার রস, পেস্তার সরবৎ, আখরোট এবং মনাক্কার মোরব্বা প্রভৃতি প্রত্যহই খাইতে হইত। কখনও তৃষ্ণা পাইলে, জল না খাইয়া এক গ্লাস আঙুরের রস পান করিত।

২

ইহার পর যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটিতে লাগিল। কোথাও কোন বৃহৎ অনুষ্ঠান বা উপলক্ষ্য হইলেই হারুর পেশী এবং পেশীর বল প্রদর্শনের

নিমন্ত্রণ আসিত। বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির প্রশংসাপত্র ও উপহার লাভ করিয়া ফেলিল। নানা প্রদর্শনীতে এবং প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে নানাবিধ ক্রীড়া প্রদর্শন দ্বারা বহু মেডাল ও কাপ সংগৃহীত হইল। কোথায়ও কোথায়ও কিছু আর্থিক লাভও হইতে লাগিল। হারু শুধু ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া সন্তরণেও পটুতা অর্জন করিল, এবং কাশী হইতে অবিরাম সন্তরণ করিয়া কলিকাতায় লঘিষ্ঠ সময়ে পৌঁছিয়া ভারতের দূর-সন্তরণের রেকর্ড ভঙ্গ করিয়া ফেলিল। দৈনিক, সাপ্তাহিক, অর্ধ-সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক এবং ত্রৈমাসিক পত্রিকায় হারুর নানা ভঙ্গীর এবং তাহার বাহু, বক্ষ, উদর, নাভি, প্রভৃতির অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নানাবিধ ফোটো আর্ট-পেপারে প্রকাশিত হইল। কলিকাতার মোড়ে মোড়ে হারুর ফোটো-কার্ড বিক্রীত হইতে লাগিল।

প্রথম কৃতকার্যতার উত্তেজনা ও উন্মাদনা ক্রমশ প্রশমিত হইল। এখন যেখানে সেখানে যখন তখন আর তেমন নিমন্ত্রণ হয় না। তবে নিয়মিত ব্যায়ামশিক্ষার্থী কয়েকটি ছাত্র এবং ছাত্রী জুটিয়াছে। পালা করিয়া সপ্তাহের দিন কয়টি এক একটি ছাত্রের বাড়ীতে অতিবাহিত হয়, কিছু আয়ও যে না হয়, তাহা নহে। ইহাদের মধ্যে একটি ছাত্রী —স্থলতা—যেমন স্বাস্থ্যবতী তেমনই বলশালিনী ছিল। হারু এই ছাত্রীটিকে নিজ শিষ্যত্বে দীক্ষিত করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। উপযুক্ত ছাত্র পাইলে কোন শিক্ষকের আনন্দ এবং উৎসাহ বর্ধিত না হয়? স্থলতার স্বাস্থ্য ও পেশীর উন্নতিবিধানকল্পে হারুকে অন্য ছাত্রগুলিকে ত্যাগ করিতে হইল। স্থলতার পিতাও বেতন দেওয়া বন্ধ করিলেন। কিন্তু হারুর উৎসাহ বাড়িয়াই চলিল। একদিন স্থলতার পিতা কয়েকজন প্রতিবেশীসহ হারুর পিতাকে চাপিয়া ধরিলেন। ফলে হারুর সহিত স্থলতার বিবাহ হইয়া গেল। শিষ্যাকে সহধর্মিণীরূপে

পাইয়া হারুর উৎসাহ শতগুণে বর্ধিত হইল। লিখনপঠন, রন্ধন, গীতবাদ্য বা অন্য কোন কাজই হারুর মনোমত হয় না। নিয়মিত নানাপ্রকার ব্যায়াম এবং ব্যায়াম সম্পর্কিত বক্তৃতা ও আলোচনা শোনাই স্থূলতার একমাত্র কর্তব্য হইয়া উঠিল। কিন্তু বিধাতা বাদ সাধিলেন। কিছুদিন পরেই তাহাকে সকল প্রকার ব্যায়াম স্থগিত রাখিয়া পিত্রালয়ে প্রস্থান করিতে হইল।

৩

হারুর এখন একটু ভবিষ্যতের ভাবনা হইয়াছে। ক্রমশ বুঝিতে পারিতেছে যে মেডাল, কাপ, এবং মাসিক পত্রিকার ফোটো জীবন-যাত্রার পাথেয়ের পক্ষে যথেষ্ট নহে। লেখা পড়া কিছুই শেখে নাই, ব্যবসায় করিবার মত অর্থ বা অভিজ্ঞতাও নাই। চিরকাল পিতার নিকট হইতে নিজের পেস্তা-বাদামের ব্যয় আহরণ করিতে ক্রমশ তাহার মনে দ্বিধা জাগিতে লাগিল। তারপর এখন নিজের সংসারের তো ভার লইবার সময় আসিতেছে। প্রতিবেশী, বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন সকলেই নানাপ্রকার পরামর্শ ও সদুপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন।

বহু চেষ্টাতেও কোথায়ও কোন ভাল কাজ জুটিল না। অবশেষে হারু স্থির করিল, মোটর-এঞ্জিনীয়ারিং শিখিবে। একটি বিখ্যাত কম্পানিতে ভর্তি হইয়া সোৎসাহে কাজ আরম্ভ করিল। কিন্তু বিপদ হইল এই যে, ওই কাজ করিয়া তাহার অভ্যাসমত ঔষধ, পথ্য ও ব্যায়ামের অত্যন্ত ব্যাঘাত হইতে লাগিল। সে দেখিল, নিয়মিতরূপে পাঁচ শত ডন-বৈঠক করা অপেক্ষা চারিখানি চাকার টায়ার টিউব

পরিবর্তন করা অথবা ছয়টি ভ্যাল্‌ভ গ্রাইণ্ড করা অনেক বেশি কঠিন। অনভ্যস্ত কাজে, আহারাদির অনিয়মে, দিবানিদ্রার অভাবে, তেল-কালির গন্ধে এবং উপরিতন শিক্ষক ও কর্মচারিগণের ভৎর্সনায় তাহার মোটর-এঞ্জিনীয়ারিং শিখিবার স্পৃহা লোপ পাইল। এদিকে তাহার সাধের পেশীগুলিও যেন কৃশ এবং লাবণ্যহীন হইয়া পড়িতে লাগিল। হারু কাজ ছাড়িয়া দিল। পাড়ার লোক জিজ্ঞাসা করিলে বলিত, আর পেট্রলের গন্ধ সহ্য হয় না।

তরুণ সাহিত্যের নায়কদের মত, হারুরও—দিন যায়। কিন্তু মনে শান্তি নাই। কর্মহীন জীবন দুঃসহ। অনেকে অনেকপ্রকার উপদেশ দিলেন, কিন্তু কোনটিই কার্যকরী হইল না। হারুর পিতার এক কণ্ট্রাক্টর বন্ধু বলিলেন, হারুকে আমার আফিসে পাঠিয়ে দিন, বাড়ি তৈয়ারির কাজ সুপারভাইজ্ করিবে। হারু সম্মত হইল বটে, কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই আবিষ্কার করিল যে, ইট, কাঠ, চুন, সুরকির তত্ত্বাবধান এবং রাজমিস্ত্রী ও কুলির সহিত বাক্‌বিতণ্ডা তাহার পেশীর কমনীয়তাবর্ধনের পক্ষে অনুকূল নহে। সুতরাং সে যেমন কর্মহীন ছিল, তেমন কর্মহীন রহিয়া গেল।

একদিন তাহার শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়েরা স্টীমারে বোটানিকাল গার্ডেনে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। ফিরিবার সময়ে একটি বালক সহসা নদীতে পড়িয়া যায়। তখনই কয়েকটি খালাসী দুই তিনটি লাইফবয় নিমজ্জমান বালকটির দিকে ছুঁড়িয়া দেয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া অতিকষ্টে বালকটিকে উদ্ধার করে। হারুর একটি শ্যালিকা একটু হাসিয়া বলিল, জামাইবাবু, আপনি তো বিখ্যাত সাঁতারু, কই ছেলেটিকে বাঁচানোর চেষ্টা তো মোটেই করলেন না, দিদির জন্যে বুঝি? হারু উত্তর দিল, দেখ, এখানে কতটুকু জল এবং স্টীমারের ডেক থেকে

জল কত ফুট নীচে তা আমার ঠিক জানা নেই ; তা ছাড়া আমার কস্ট্যুমটাও সঙ্গে আনি নি, কাজেই—

৪

আবার—দিন যায়। একদিন সংবাদপত্রে একটি বিজ্ঞাপন দেখিলাম, পেশী-পার্কে বিরাট সভা। বক্তাগণের মধ্যে প্রথমেই নাম দেখিলাম—প্রফ. এইচ. গাঙ্গুলি। ঐ দিকেই বিকেলবেলায় একটু অন্য কাজও ছিল, ভাবিলাম পার্কে ঢুকিয়া শোনাই যাক, কে কি বলে! ভিড় ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া সবিস্ময়ে দেখিলাম, আমাদের হারু গেরুয়া পাগড়ি ও গেরুয়া আলখাল্লা পরিয়া বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। পরিচিত লোক দেখিয়া বক্তৃতা শুনিবার আগ্রহ কমিয়া গেল, তথাপি কয়েক মিনিট অপেক্ষা করিলাম। নিম্নলিখিত কথাগুলি কানে গেল—

পেশী দুই প্রকার, শুদ্ধ এবং ব্যবহারিক (অর্থাৎ, muscle দুই প্রকার, pure এবং applied)। আমরা যে পেশীর অনুশীলন করিয়া থাকি, তাহা শুদ্ধ পেশী ; ইহার প্রধান কার্য—প্রদর্শন। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কমনীয় পেশীগুলির লালনপালন, বর্ধন, স্ফীতীকরণ, সঞ্চালন, নর্তন ও জনসাধারণকে প্রদর্শন, ইহাই আমাদের মুখ্য কর্তব্য। গৌণত, এই পেশীদ্বারা লৌহদণ্ড বক্রীকরণ, ভারোত্তলন, প্রভৃতি ক্রীড়া করা যাইতে পারে। ইহাও অবশ্য প্রদর্শন উপলক্ষে ; কারণ যদি সত্যই পথিমধ্যে কোন গুরুভারদ্রব্য উত্তোলন আবশ্যক হইয়া পড়ে, তাহা হইলে কুলিদিগকে আহ্বান করাই বিধেয়। আমাদের এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে, আমাদের পেশী ব্যবহারিক পেশী নহে। ইহা দ্বারা

অযথা সাংসারিক কাজ করানো চলিবে না। ভূমিকর্ষণ, কাষ্ঠবিদারণ; নৌকাবাহন, মোটরচালন, ভারবহন, প্রভৃতি কার্যের জন্য যে পেশীবল আবশ্যক, তাহার অনুশীলন ভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তিগণ করিয়া থাকেন। যেমন ভারবহনের জন্য এবং গঙ্গায় নৌকাবাহনের জন্য পশ্চিমদেশীয় কুলি ও মাঝি, কর্পোরেশনের কাজ করিবার জন্য উড়িয়া মিস্ত্রি, মোটরাদি চালনের জন্য পাঞ্জাবী ভ্রাতৃবৃন্দ প্রভৃতি, সকলেই ব্যবহারিক পেশীবলে আমাদিগের অশেষ কল্যাণসাধন করিতেছেন। এই সকল ব্যাপারে আমাদের হস্তক্ষেপ না করাই ভাল। ইত্যাদি।

আমার আর সময় ছিল না—পেশী-পার্ক হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম।

অক্টোবর, ১৯৩৭

আপ্যায়ন

[স্থান—দীনেশবাবুর বৈঠকখানা। কাল—অপরাহ্ন।
পাত্র—দীনেশবাবু ও যোগেশবাবু]

দী। আরে, যোগেশ যে, এস এস।

যো। তবু যা হোক্, চিনতে পেরেছ।

দী। চিনতে পারবো না কি হে। এই ত টোয়েন্টি-সিক্সে তুমি আর আমি হিন্দু হস্টেলে পাশাপাশি ঘরে ছিলুম, আর এই নয় বৎসরেই ভুলে যাব। যাক, এখন কোথায় আছ? কি করছ? বে-থা করেছ? ছেলেপুলে হয়েছে? এখন কোত্থেকে আসছ? এতদিন পরে আমাকে মনে পড়ল?

যো। তোমার এতগুলো প্রশ্নের জবাব দিতে একটু সময় লাগবে। তা তোমার খবর কি, বল। ভাল আছ ত? শুনেছি ওকালতীতে বেশ নাম করেছ।

দী। এক রকম চলে যাচ্ছে—যা কম্পিটিশান। এ বাজারে আমাকে—তা—এক রকম সাক্‌সেস্‌ফুলই বলতে পার। সে সব কথা থাক এখন। তোমাকে ত বেশ টায়ার্ড্ মনে হচ্ছে। আচ্ছা, ঠাণ্ডা হয়ে নাও। চা খাবে?

যো। চা ত আমি খাই না।

দী। তা হলে একটা ডাব, কিংবা লেমনেড, কিংবা ঘোলের সরবৎ—

যো। আহা, তুমি অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন, বল ত?

দী। না, না, ব্যস্ত হবার আর কি; তুমি ত অপরিচিত লোক নও। তা হলে বরঞ্চ বরফ দিয়ে একটা লেমন স্কোয়াশ খাও—কি বল?

যো। আচ্ছা সে হবে 'খন। এতদিন পরে দেখা, একটু সুখ দুঃখের কথা হোক।

দী। তা বেশ ত। কথাবার্তাও হোক, সঙ্গে সঙ্গে একটু পানাহারও চলুক—কি বল? এই গরমের দিনে কিছু ফলটল খেতে আপত্তি নেই ত? একটা আম, গোটা কয়েক লিচু, একটু তরমুজ, কিংবা বেলের সরবৎ, কি বল? সঙ্গে দুকুচি শশা একটু লেবুর রস দিয়ে, গোটা কয়েক জামরুল—আনারস ত এখনো ওঠেনি—দার্জিলিং থেকে যা দুচারটা আসে ভয়ানক দাম। তা থাক গে, বরঞ্চ দু একটা কমলালেবু মন্দ হবে না। (উচ্চৈঃস্বরে) ওরে জগা—এদিকে শোন ত।—ব্যাটা বুঝি ছেলেদের নিয়ে পার্কে গেছে—এখনই এসে পড়্বে।

যো। তুমি ত ভারি ব্যস্তবাগীশ হে। যা মনে করে এতদিন পরে তোমার কাছে এলাম, সেই কথাটাই আগে শোন। আদর আপ্যায়নে একটু দেরীই না হয় হ'ল।

দী। সে কি একটা কথা হ'ল যোগেশ—এতদিন পরে দেখা—আমার কত আনন্দ হচ্ছে। যা গরম পড়েছে, নইলে দুটো ডালমুট কি চীনাবাদাম মন্দ হ'ত না। গল্প করার পক্ষে এমন কন্‌ভিনিয়েণ্ট খাবার আর নাই। দু ঘণ্টা ধরে ক্রমাগত খেলেও চার আনার বেশী খরচ হয় না।—সত্যি তোমাকে বড় টায়ার্ড্ মনে হচ্ছে, কিছু না খেলে আমি তোমার সঙ্গে কথাই বলবো না।

যো। আমি কি 'খাব না' বলেছি?—বেশ ত, যা দেবে তাই খাব 'খন। তবে তুমি অত ব্যস্ত হয়ো না।

দী। না, না—ব্যস্ত কেন হব। আচ্ছা, বরঞ্চ একটু মিষ্টি খেয়ে জল খেয়ে নাও। গোটা দুই সন্দেশ, কিংবা রসগোল্লা, একটা চম্‌চম্,

একখানা গজা, সঙ্গে খান দুই শোনপাপড়ি—আমাদের এই মোড়ের দোকানের শোনপাপড়ি খুব প্রসিদ্ধ—শোনপাপড়ি তুমি পছন্দ কর ত? শুধু মিষ্টি যদি ভাল না লাগে, বরঞ্চ সঙ্গে নোন্‌তা কিছু—শিঙাড়া বা খাস্তা কচুরি আর খানকতক নিমকি আনুক—কি বল? তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, শুধু টায়ার্ড নও—ক্ষিদেও তোমার পেয়েছে। ওরে জগা, এলি? কখন যে ব্যাটা ফিরবে! উল্লুকটা জ্বালিয়ে খেলে।

যো। তুমি অস্থির হয়ে উঠলে যে, ছেলেরা বেড়াতে গেছে—এখুনি ফিরবে 'খন।

দী। হ্যাঁ, এই এল বলে। কাছেই গণেশ ময়রার দোকান, ওখান থেকে গোটাকয়েক আইসক্রীম সন্দেশ আনান যাবে, কি বল? গরমের দিনে আইসক্রীম সন্দেশটা আমার খুব ভাল লাগে। ওদের রাবড়ীটাও ভাল। পো'টাক রাবড়ীও আনান যাবে'খন। সেদিন কখানা ছানার জিলিপী আনিয়েছিলাম—খাসা। তুমিও একখানা খেয়ে দেখো। সঙ্গে দুখানা ঢাকাই পরোটাও আনান যাবে'খন, কি বল? তোমার ডিস্‌পেপ্‌সিয়া-টিয়া নেই ত? বরঞ্চ, খাওয়ার পরে এক ডোজ একোয়া-টাইকোটিস্‌ খেয়ে নিও—ঘরেই আছে।

যো। আচ্ছা, সে হবে'খন। এবার কাজের কথাটা পাড়ি।

দী। ঐ তোমাদের এক কথা। কাজ আর কাজ। কাজ ত সারা জীবন ধরেই আছে। এতদিন পরে দেখা, আমার কত আনন্দ হচ্ছে। এখন কতকগুলো শুকনো কাজের কথা পেড়ে এই আনন্দটাকে মাটি করে দিও না। একটু স্থির হয়ে বস, ক্রমশ সব শোনা যাবে'খন।

যো। বড্ড ভাই দেরী হয়ে যাচ্ছে। আমার আবার আর এক জায়গায় যাবার কথা আছে। শোন, কাজের কথাটা বলেই ফেলি।

দী। আচ্ছা, রোস, দেখি জগাটা এল নাকি। ব্যাটাকে এ মাস পরেই যদি না বিদেয় করি। সন্ধ্যে হয়ে এল, ছেলেপুলেগুলোর ঠাণ্ডা লাগবে—এখনো ফিরবার নামটি নেই। দেখ, বরঞ্চ এক কাজ কর। সন্ধ্যে ত হয়ে এল। এ বেলাটা এখানেই থেকে যাও। আমরা সকালেই খাই—একেবারে আমাদের সঙ্গে দুটো খেয়ে যেও। কি বল?—না, না, তোমার কোন অমত শুনবো না।—এই ধর দুখানা লুচি, পটলভাজা, আলুর দম—সঙ্গে একটু মুড়ি-ঘণ্ট—তুমি মাছ মাংস খাও ত? তবে আর কি, দুখানা চপ কাটলেটও ঐ সঙ্গে হবে' খন। দুটো ঘি-ভাত না হলে তোমার বৌদির তৃপ্তি হবে না। সঙ্গে একটু রুই মাছের কালিয়া, একটু মাটন-কোর্মা—আর যদি তোমার মুরগীতে আপত্তি না থাকে, তাহলে একটু চিকেন-দোপেঁয়াজী করতে বলে দিই—কি বল? কথায় আছে আপ রুচি খানা—তোমার যেটা ভাল লাগে, তাই তুমি খাবে, এতে আর কি আছে। খাবার পরে একটু দই, চাটনি খেলেই সব হজম হয়ে যাবে। তা তুমি ত আর পেট-রোগা নও। তা হলে বস, আমি তোমার বউদিকে বলে আসি—আমার একটি পুরাতন বন্ধু আজ আমাদের সঙ্গে খাবেন।

যো। না, না, সে হবে না, আমাকে এখনই উঠতে হবে।

দী। সে হ'তেই পারে না, এতদিন পরে দেখা—তোমার সঙ্গে একটু আমোদ আহ্লাদ না করে কিছুতেই ছাড়বো না। (বাটীর ভিতরে গিয়া কয়েক মিনিট পরে ফিরিয়া আসিয়া, অতি শুষ্কমুখে) ভাই, কি বলবো, তোমার বৌদির হিস্টিরিয়ার ফিট্

হয়েছে—ঝিটা কোন রকমে জড়িয়ে ধরে বসে আছে। এখনই আমাকে ডাক্তারের বাড়ী যেতে হবে।

যো। আমিও উঠি—আমাকেও এক যায়গায় সাতটার আগেই যাবার কথা। বউদির হিস্টিরিয়া না হলেও আমাকে সেখানে সময়মত যেতেই হ'ত। দেখ, গলাটা শুকিয়ে গেছে—একটু জল দিতে পার ?

দী। নিশ্চয়ই। (ভিতরে গিয়া এবং ফিরিয়া আসিয়া)—ভাই, কি আর বলব ! এ পাড়ার উপর কর্পোরেশনের যা শুভ দৃষ্টি—ঝিটা আজ সময়মত জল ধরতে ভুলে গেছে। ছি, ছি, কি কাণ্ড ! এতদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা—এক গ্লাস জল তোমায় দিতে পারলুম না। আমি কালই কর্পোরেশনের নামে নালিশ করবো। ভাই কিছু মনে করো' না—ঐ রাস্তার মোড়েই একটা হাইড্র্যাণ্ট আছে। বরঞ্চ—

যো। আচ্ছা আসি।

মার্চ, ১৯৩৫

পদ্মা

শরতের পদ্মার বুকে সন্ধ্যা নামিতেছে। একূল ওকূল দেখা যায় না। যেদিকে সূর্য অস্ত গিয়াছে, সেদিকে এখনও একটা সোনালী রংয়ের ছোপ জলের উপর লাগিয়া আছে, জরির পাড়ের মতই ঝিকমিক করিতেছে। মৃদুমন্দ বাতাস বহিয়া যাইতেছে, জলের উপরে ছোট ছোট ঢেউয়ের রাশি থর থর করিয়া যেন কাঁপিতেছে। আকাশে এখনও দুই এক ঝাঁক বক দ্রুত উড়িয়া যাইতেছে, একটু পরে আঁধার নামিলে আর তাহারা পথ দেখিতে পাইবে না।

ছোট একখানি পানসি। দুইটি মাঝি, দুইটি আরোহী। একখানি ছোট সাদা পাল বায়ুর চাপে ঈষৎ ফুলিয়া উঠিয়াছে। মৃদুমন্দ গতিতে পানসিখানি চলিয়াছে, ছোট ছোট ঢেউগুলি নৌকার নীচে মধুর কুলুকুলুধ্বনি তুলিয়াছে, পিছনের মাঝি হাল ধরিয়া বসিয়া তামাক সেবন করিতেছে, দাঁড়ী দাঁড় ছাড়িয়া পালের দড়ি ধরিয়া বসিয়া আছে।

নৌকার মধ্যে একটি যুবক এবং একটি যুবতী, বীরেশ আর রমা, একখানি শতরঞ্জির উপর বসিয়া আছে। পাশে দুইটি সুটকেস, একটি ছোট বিছানা, একটি টিফিন-ক্যারিয়ার, একটি লণ্ঠন আর একটা ছাতা। দুইজনে দুইটি সুটকেসে হেলান দিয়া মুখোমুখি হইয়া বসিয়া আছে। রমা বলিল, সন্ধ্যা তো হয়ে এল, আর কতদূর ?

—আর বড় জোর ঘণ্টাখানেক।

—আমার কিন্তু ভয় করছে।

—ভয় কি ? আমরা তো প্রত্যেক বছরই কতবার ক'রে এ পথে যাতায়াত করছি। তুমি তো আগে কখনও আস নি, তাই। দেখ,

কি সুন্দর নদী, কত বড়, সামনের ওই নৌকাখানা মনে হচ্ছে যেন একখানি ঝিনুক, বা তার চেয়েও ছোট !

—সত্যি, কি সুন্দর ওই পালগুলো, ঠিক যেন পাখীর ডানা ! কি সুন্দর বাতাস, এমন মিষ্টি বাতাস আমি জীবনে কখনও দেখি নি !

—তোমার কাছে তো এখন সবই মিষ্টি লাগবে।

—কেন, তোমার কাছে ?

—আমার কাছেও, রমা। এতদিন পরে আজ আমি তোমায় সঙ্গে নিয়ে নিজের ঘরে যাচ্ছি, একথা মনে হতেই আমার মন আনন্দে ভ'রে উঠেছে। কি করব, ভেবে পাচ্ছি না।

—আঃ, আস্তে, ওই সামনে মাঝি ব'সে রয়েছে, তা বুঝি ভুলেই গেছ ?

—আমি আজ সবই ভুলে গেছি, রমা। আমার সব পাগলামিই সইতে হবে তোমায়। একটা গান গাইবে ?

—যাও ! এখন কি গান গাইব, মাঝিদের সামনে ?

—থাকগে মাঝি, তুমি গাও।

রমা সুটকেসের উপর মাথাটি রাখিয়া গুন্‌গুন্ করিয়া গাহিতে লাগিল—অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দমধুর হাওয়া, দেখি নাই কভু দেখি নাই, এমন তরণী বাওয়া—

গান শেষ হইলে, রমা বলিল, একটুতেই অমন হাঁপিয়ে উঠি কেন ?

—অমন হয়।

উভয়েই নীরব। একটু পরে বীরেশ একটু তন্দ্রাভিভূত হইল, রমা তাহার কোলের কাছে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ একটা ঝাঁকানি খাইয়া উভয়েই জাগিয়া উঠিল। তখন বাতাস বেশ জোরে বহিতেছে, মাঝি তাড়াতাড়ি পাল নামাইয়া

লইয়াছে। আকাশের ঈশান কোণে বিদ্যুৎ চমকাইতেছে, ক্রমশঃ ঘনকৃষ্ণ মেঘরাশি আকাশ ছাইয়া ফেলিতেছে। টপটপ করিয়া বৃষ্টির ফোঁটা নৌকার ছইয়ের উপর পড়িতেছে, মাঝিরা গামছা খুলিয়া মাথায় ও পিঠে দিয়াছে।

রমা ভীত হইয়া বলিল, কি হবে ?

—অত ভয় পাচ্ছ কেন ? আজকালকার ঝড়বৃষ্টি বেশিক্ষণ হয় না, এই আছে, এই নেই। একটু পরেই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে।

রমাকে অভয় দিলে কি হইবে ? বীরেশও রীতিমত ভয় পাইয়াছে। চারিদিকে ভীষণ অন্ধকার। একটু আগে দুই একখানা নৌকার পাল দেখা যাইতেছিল, এখন তাহাও নাই। চারিদিকে শুধু জল আর জল, আর গাঢ় অন্ধকার। জল ও আকাশ অন্ধকারের মধ্যে মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে। শন শন, শোঁ শোঁ, হু হু করিয়া বাতাস বাড়িয়াই চলিয়াছে। মাঝি নিরুপায় হইয়া হাল ধরিয়া বসিয়া আছে, নৌকা যেদিকে ইচ্ছা ছুটিয়া চলিয়াছে ; কখনও বাঁয়ে, কখনও ডাইনে অত্যন্ত কাত হইয়া পড়িতেছে ; রমা অস্ফুট আর্তনাদ করিতেছে, বীরেশ কম্পিতকণ্ঠে বৃথা অভয় দিবার চেষ্টা করিতেছে।

মাঝি বলিয়া উঠিল, বাবু, আর বুঝি পারি না। আতঙ্কে বীরেশ শিহরিয়া উঠিল, মূর্চ্ছিতপ্রায় রমাকে প্রাণপণে জড়াইয়া ধরিল। মাঝি পুনরায় বলিল, বাবু, নৌকা তো আর বাঁচে না।

বীরেশ এবার আর ভীত কম্পিত নয়। বজ্রমুষ্টিতে রমাকে ধরিয়া বলিল, অমন ক'রে থাকলে তো চলবে না, নৌকা বোধ হয় এখুনি ডুববে, আমাদেরও জলে ঝাঁপ দিতে হবে।

রমাও যেন সহসা জ্ঞান ফিরিয়া পাইয়াছে। বলিল, তা দোব, কিন্তু আমি যে সাঁতার জানি না।

—তা নাই জানলে। আমি যা বলি, করতে পারবে তো ?

—নিশ্চয়ই।

একটু পরেই জলে যেন একটা বিকট আলোড়ন সুরু হইল, সঙ্গে সঙ্গে একটা ভীষণ বাতাসের ধাক্কা খাইয়া নৌকাখানি কাত হইয়া প্রায় ডুবিয়া গেল। মাঝি দুইটি চীৎকার করিয়া উঠিল, ইয়া আল্লা, আমাদের প্রাণ নিতে চাও নিও, কিন্তু ওই সোনার ঠাকরুণটিকে বাঁচিও।—ইহা বলিয়াই তাহারা জলে ঝাঁপ দিল।

বীরেশ এক টানে তাহার জামা ছিঁড়িয়া খুলিয়া ফেলিয়া রমাকে লইয়া জলে ঝাঁপ দিতেই নৌকাখানি ডুবিয়া স্রোতের টানে অদৃশ্য হইয়া গেল। বীরেশ বলিল, তুমি আমার পিঠের ওপর দিয়ে কাঁধে হাত দিয়ে ভেসে থাক, আমি সাঁতরাতে থাকি ; হয় কোন নৌকার সঙ্গে দেখা হবে, কিংবা হয়তো একটা চড়া-টড়াতে গিয়ে ঠেকতে পারি।

রমা বীরেশের কথামত কাঁধে হাত দিয়া বলিল, এই রকম ?

—হ্যাঁ, কি আশ্চর্য! সাঁতার-না-জানা লোকে এমন ক'রে সাবধানে আর একজনের কাঁধে হাত দিয়ে ভেসে থাকতে পারে, এ যে ভাবতেই পারছি নে।

—কেন, তুমি যে বললে অমনি ক'রে থাকতে!

—তা তো বললুম, কিন্তু তুমি পারলে কি ক'রে তাই ভাবছি! যারা সাঁতার জানে না, তাদের অজ্ঞান ক'রে না ফেলে বাঁচানোই যায় না। কাছে কাউকে পেলে তারা নিরুপায় হয়ে জড়িয়ে ধরে, দুজনেই ডোবে। কিন্তু কি অসীম ধৈর্য তোমার!

—তুমি যে বললে!

—আমি তো বললুম, তুমি পারলে কি ক'রে ?

—আমি যে বাংলার মেয়ে। আমি যে তোমারই রমা।

—রমা!

—কি?

—তুমি দেবী।

—হিঃ—হিঃ—হিঃ।

—কি, হাসলে যে?

—তোমার যা কথা!

—দেখ তো, কোন নৌকা-টৌকা নজরে পড়ে কিনা!

—কই, কিছুই তো দেখছি না! চারিদিকে তো ভীষণ অন্ধকার। তবে বাতাসটা একটু কমেছে।

—দেখ, কিছু মনে ক'র না, শাড়িখানা খুলে ফেলে দাও, একটু ভার কমুক, শেমিজ থাক।

—আচ্ছা, এই ফেলে দিলাম, তোমার খুব পরিশ্রম হচ্ছে, না?

—এখনও তেমন হচ্ছে না, তবে—

—তাই তো, কোথাও কোন কিছুর চিহ্ন দেখা যায় না। আকাশটা কিন্তু একটু পরিষ্কার হচ্ছে।

—হ্যাঁ, ওই দেখ, চাঁদও যেন উঠ্‌ছে একটু একটু ক'রে। দেখ, আমি যেন একটু ক্লান্ত বোধ করছি। একা তো পাঁচ ছ ঘণ্টা অনায়াসে সাঁতরাতে পারি, কিন্তু—

—আমাকে নিয়ে আর কতক্ষণ সাঁতরাবে বল! আচ্ছা, ওই একখানা নৌকার পাল না—চাঁদের আলোয় চক্‌চক করছে?

—হ্যাঁ, পালই তো, কিন্তু ও যে অনেক দূর, অতদূর পৌছতে অনেক সময় লাগবে। তা ছাড়া ও নৌকাটা কোন্ দিকে যাচ্ছে, তাই বা কে জানে! দেখ, আমার হাত দুটো যেন অবশ হয়ে যাচ্ছে।

—তাই তো! তা হলে আমি তোমাকে ছেড়ে দিই।

—সেকি! সে কখনও হতে পারে না, তোমাকে ছেড়ে আমি যাব না, ডুবতে হয়, দুজনেই ডুবব।

—পাগলামি ক'র না। আমি মেয়েমানুষ, আমি গেলে কারও কোন ক্ষতি হবে না। তুমি বাঁচবার চেষ্টা কর। পুরুষ তুমি, তোমার অনেক শক্তি, অনেক সুযোগ, অনেক দায়িত্ব, আমার জন্যে নিজেকে বিসর্জন দিও না। পরিবারের জন্যে, সমাজের জন্যে অনেক কাজ তোমায় করতে হবে। তুমি থাক, আমি বরং যাই। তুমি একা একা দু তিন ঘণ্টা সাঁতরাতে পারলেও হয়তো একটা আশ্রয় মিলবে। অনুমতি দাও, আমি যাই।

—একি অদ্ভুত ব্যাপার, রমা! এমন ক'রে স্বামীর গায়ে হাত রেখে, ভেবে-চিন্তে নিশ্চিন্তমনে কেউ প্রাণ দিতে পারে, এ যে কল্পনাও করতে পারছি নে, রমা! কি দিয়ে গড়া তোমার দেহ? কি দিয়ে গড়া তোমার মন? কি দিয়ে গড়া তোমার প্রাণ? এই ইন্দ্রজাল দেখবার জন্যেই কি ভগবান তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন? মানুষ যে মানুষের চেয়ে কত বড়, তা তো তোমাকে না দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না! না, রমা, আমি তোমায় ছাড়ব না। আমিও তোমার সঙ্গে যাব। আর তো পারছি নে।

—ছিঃ, আবার ওই কথা! লক্ষ্মীটি, আমায় যেতে দাও।

—কি ক'রে এ কথা বলছ তুমি? মানুষে এ পারে কেমন ক'রে?

—আমি যে বাঙালীর মেয়ে। আমরা সব করতে পারি, প্রাণ দেওয়া তো অতি তুচ্ছ। যাক্, তুমি অত্যন্ত হাঁপিয়ে উঠেছ, আর না, লক্ষ্মীটি একবার ঘাড়টি একটু ফেরাতে পারবে? এই অসীম জলরাশির মধ্যে, এই অসীম আকাশের নীচে, এই অসীম জ্যোৎস্নালোকে, আমার

অসীম সাধনার ধন, তোমার ওই ক্লান্তশ্রান্ত মুখখানি একবার জন্মের মত দেখে যাই। আচ্ছা, যাই।

রমা ধীরে বীরেশের কাঁধ হইতে তাহার ক্ষীণ হাত দুইটী সরাইয়া লইল, এবং তৎক্ষণাৎ পদ্মার জলরাশি পূজার নৈবেদ্যের মতই এই মহীয়সী রমণীমূর্তিটি আত্মসাৎ করিল। অর্ধচেতন, অর্ধ-অসাড়, অর্ধ-অবশ বীরেশ চাহিয়া দেখিল, অনতিদূরেই তাহার সাধের প্রতিমা বিসর্জিত হইল, বোধ হয় শ্বাসরোধজনিত অসহ বেদনায় কাতর রমার একখানি হাতের চম্পককলিসদৃশ কোমল আঙুল কয়টি একবার জলের উপর দেখা গেল, বীরেশেরই দেওয়া আঙটিটি তাহার অনামিকায় চাঁদের আলোয় যেন একবার চিক্‌চিক্ করিয়া উঠিল, তাহার পরেই সব শেষ। বীরেশের হৃৎপিণ্ডটা যেন কে ছিঁড়িয়া লইল।

একান্ত মুমূর্ষু বীরেশ যেন শুধু আত্মরক্ষার স্বাভাবিক প্রেরণাবশতই চিৎ হইয়া নিজের অতি শ্রান্ত দেহটিকে কোনমতে জলের উপর ভাসাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেই তাহার মাথাটা কিসে যেন ঠেকিল! হাত বাড়াইয়া দেখে, একটা চড়া।

একি নির্মম উপহাস তোমার, বিধাতা!—বলিয়াই বীরেশ বালুর চড়ার উপর মূর্ছিত হইয়া পড়িল।

জুলাই, ১৯৩৮

মজুরি

মুটে চলিয়াছে।

পিছনে চলিয়াছে বিনয়। একটি বাসনের দোকানে ঢুকিয়া একটি বেশ গভীর এনামেল করা গামলা কিনিয়া মুটের ঝাঁকায় তুলিয়া দিল।

মুটে চলিয়াছে। বিনয় আবার ঢুকিল একটি বড় মনোহারী দোকানে—ফিরিল বড় এক কৌটা মাস্টার্ড লইয়া।

খানিক দূর গিয়া বিনয় একটি ডাক্তারী দোকানে ঢুকিল। সেখানে কিনিল, ক্যাফিঅ্যাস্‌পিরিন এক টিউব, ভেরামন এক টিউব, ব্রোমাইড্‌ মিক্‌শ্চার এক শিশি আর তুলা আধ পাউণ্ড।

মুটে চলিয়াছে। বিনয় আবার ঢুকিল একটি মনোহারী দোকানে। এখানে কিনিল, স্মেলিং সল্ট তিন শিশি, ওডিকোলোন তিন শিশি, দেশী এসেন্স তিন শিশি, বিলাতী এসেন্স তিন শিশি, পরিমল নস্য এক শিশি, চা এক পাউণ্ড, বিস্কুট এক টিন, চকলেট এক বাক্স, তোয়ালে দুইখানা আর চীনা ধূপ এক আঁটি।

ফর্দের দিকে চাহিয়া বিনয় দেখিল, একটা ভুল হইয়া গিয়াছে। আবার একটি ডাক্তারী দোকানে ঢুকিয়া কিনিল এক শিশি লিট্‌ল্‌স্‌ ওরিয়েন্টাল বাম। ঐ সঙ্গে এক বোতল গোলাপ জল, এক শিশি ইনোর ফ্রুট সল্ট, এক শিশি ক্রুশেন সল্ট, এক টিউব ফস্‌ফরিন এবং এক বোতল মল্টও কিনিয়া লইল।

মুটে চলিয়াছে। বিনয় এবার ঢুকিল একটি বৈদ্যুতিক দোকানে। তিনটি ফিকে সবুজ রংএর বাল্‌ব কিনিয়া লইল এবং একখানি টেব্‌ল্‌-

ক্যান দৈনিক আট আনা অথবা মাসিক পাঁচ টাকা হিসাবে ভাড়া করিয়া লইয়া মুটের মাথায় তুলিয়া দিল।

সামনেই বাজার। ভিতরে গিয়া খুঁজিয়া হাতপাখার দোকানে গিয়া বড়, মাঝারি এবং ছোট তিনখানি পাখা কিনিল। ফিরিবার পথে বেনে-দোকান হইতে আধখানা চিকী সুপারী কিনিয়া পকেটে পুরিল। আর একটি পাঁচনের দোকান হইতে একটি শিকড় কিনিয়া বুকপকেটে রাখিল।

আবার তাহারা চলিয়াছে। পথের পাশে কবিরাজী দোকান। বিনয় দোকানে ঢুকিয়া এক ছটাক বৃহৎ দশমূল তৈল, এক ছটাক নাসিকা বিমর্দন ঘৃত, সাত বড়ী মহালক্ষ্মীবিলাস, আর যন্ত্রণান্তিকা গুড়িকা তিন প্যাকেট কিনিয়া আনিয়া মুটের ঝাঁকায় রাখিয়া দিল।

মুটে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। বিনয় আশ্বাস দিল, তাহার মজুরি পোষাইয়া দিবে। মুটে পুনরায় নিঃশব্দে চলিয়াছে।

একটি রাস্তার মোড়ে আসিয়া একটা বইয়ের স্টলের সামনে মুটেকে দাঁড় করাইয়া বিনয় স্টলের উপর চোখ বুলাইতে লাগিল। অভিনয়, স্টার ও স্টারিকা, হলিউড-বিনোদিনী, প্রভৃতি খান দশেক সাপ্তাহিক পত্রিকা, রৌদ্র-স্নান, স্নান ও স্বাস্থ্য, প্রভৃতি খান আষ্টেক পাক্ষিক পত্রিকা, খালি গল্প, শুধু গল্প, আরো গল্প, বাজে গল্প, রাবিশ গল্প, তবু গল্প প্রভৃতি খান পনের মাসিক পত্রিকা এবং কেবল মজা, ধাঁধাঁ ও হেঁয়ালী প্রভৃতি খান পাঁচেক দৈনিক কিনিয়া মুটের মাথায় চাপাইয়া দিল। মুটে ভাবিল, মজুরি পোষাইয়া লইব।

বিনয় পকেট হইতে ফর্দ বাহির করিল।

মুটে চলিয়াছে। বিনয় থামিল একটা বইয়ের দোকানে। ফর্দে

ছিল, বই। কিন্তু কি বই তাহা মুটেকে পথে বসাইয়া স্থির করিতে হইবে। বিনয় বইয়ের শেল্‌ফ্‌ এবং আলমারির দিকে চাহিতে লাগিল! রবিবাবুর নৌকাডুবি, চোখের বালি ও শরৎচন্দ্রের দেবদাস, চরিত্রহীন, প্রথমেই মনে পড়িল। বঙ্কিম? এই তো সেদিন তাঁর জয়ন্তী হইয়া গেল—বই আর পড়িয়া কি হইবে? এখন অত ভাবিবার সময়ও বিনয়ের নাই! সে রামার স্বপ্ন-লহরী, শামার রোমাঞ্চনাটিকা, যদুর বিচিত্র-মালিকা, মধুর কিশোরী-বিলাপ প্রভৃতি যাহা সম্মুখে পাইল, তাহারই খান দশ বারো বই কিনিয়া ঝাঁকায় পুরিল। দোকান হইতে বাহির হইবে, এমন সময়ে জানালায় একখানা বই দেখা গেল—নাম নাই, দাম নাই—এক টুকরা কাগজ ও আঠা দিয়া বন্ধ করা, খুলিবারও যো নাই। খেলার মাঠে চানাচুর ভাজার মত আগে দাম দিয়া পরে খুলিতে হইবে। একখানা কিনিয়া বিনয় মুটের মাথায় ছুঁড়িয়া দিল।

রাস্তার মোড় ঘুরিতেই একটা ফুলের দোকান। বিনয় বাছিয়া বাছিয়া দু'ডজন গোলাপ ফুল, তিনটা বেলফুলের মালা, আর এক চুপড়ী ঝুরো ফুল কিনিয়া মুটের মাথায় চাপাইয়া দিল।

তারপর আবার একটি বেনে দোকানে ঢুকিয়া এক প্যাকেট চন্দোসী আটা এবং এক টিন ভাল ঘি কিনিয়া, বিনয় মুটেকে বলিল, এইবার হো গিয়া।

সামনে দেখা রাখালের সঙ্গে। রাখাল বলিল, কি হে, ব্যাপার কি? মুটের মাথায় তো দেখছি একটা পাহাড়!

আর বল কেন! এই নাও ফর্দ। আচ্ছা, তুমি একটু মুটেটাকে দেখ তো, আমি এই দোকান থেকে একটা ফোন করে আসি।

বিনয় ফোন করিয়া ফিরিয়াছে। রাখাল বলিল, কিছুই তো বুঝ্‌তে পারছিনে। ভেবেছিলাম বুঝি পূজোর ফর্দ—কিন্তু এ সব মাথামুণ্ডু—

আর বল কেন, ভায়া। আপিস থেকে ফিরে দেখি গিন্নী গেছেন রেডিওতে গান দিতে। ফিরে এসেই মাথায় হাত দিয়ে শুয়ে পড়েছেন —ভীষণ মাথা ধরেছে। কি করি, তাড়াতাড়ি একটা ফর্দ করে নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হল। আচ্ছা আজ আসি ভাই, ডাক্তারকে ফোন করলুম, এখনই হয় তো এসে পড়বে!

রাখাল খানিকক্ষণ হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া চলিয়া গেল।

মুটে তাহার মজুরি পোষাইয়া লইয়াছে।

বিনয়ের মজুরি পোষাইয়াছে তো?

জুন, ১৯৩৮

খুব চিনি

১

যদু। যাই বল, এ আমি কিছুতেই সমর্থন করতে পারি নে।

মধু। কেন, তাতে হয়েছে কি? বাড়ির ভেতর এত যায়গা কোথায়? এতগুলি ভিখিরীকে খাওয়াতে হ'লে এমনই ফুটপাতে বসিয়ে খাওয়ানো ছাড়া উপায় কি?

য। উপায় না থাকে, না খাওয়ালেই হয়। খাবারের বদলে পয়সা দিলেই চলতে পারে। যত সব নোংরা, রুগ্ন লোকগুলো সমস্ত রাস্তাটাকেই নোংরা ক'রে তুলেছে। কত রকম রোগের জীবাণু এরা ছড়াচ্ছে, তার ঠিক কি! আইন ক'রে এসব বন্ধ করা উচিত। নেহাত দয়া যদি করতেই হয়, তবে পয়সা দিয়ে বিদেয় করাই উচিত।

ম। তোমার সঙ্গে একমত হ'তে পারলুম না। খাওয়ানোর মধ্যে যে স্নেহ, যে তৃপ্তি, যে আনন্দ, তা শুধু পয়সা ছুঁড়ে ফেলে দিলেই হয় না। জামাইষষ্ঠীর দিন পাঁচ সিকে পয়সা দিয়ে জামাইকে একটা হোটেল দেখিয়ে দিলে শ্বশুরমহাশয় নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন, কিন্তু শাশুড়ীঠাকুরাণী অনশন-ব্রত গ্রহণ করবেন নিশ্চয়। পথের ঐ ভিখিরীগুলোও পাত পেতে ব'সে খেয়ে যে আনন্দ পাবে, পয়সা নিয়ে তা কখনও পাবে না। খাওয়ানোটা শুধু দান নয়; ওটা সেবা, ওটা পূজা।

য। বলি, এ পূজাটা করছে কে হে, জান? এ পাড়ার এমন রাজা জমিদার কেউ আছে ব'লে তো শুনি নি। তুমি তো এ পাড়ার খবর রাখ। চেন লোকটাকে?

ম। খুব চিনি। রাম চাটুজ্জেকে এ অঞ্চলে সবাই চেনে। এমন সদাশয় লোক দেখা যায় না।

২

মধু। অত ভাবছ কি?

হরি। ভাব্‌ব না তো আর কর্‌ব কি?

ম। ব্যাপার কি, বলই না?

হ। শুনে আর কি করবে বল, কোন লাভ নেই।

ম। লাভ না থাক, মনের দুঃখ অপরকে জানালে হয়তো একটু সান্ত্বনা পেতে পার!

হ। আর সান্ত্বনা! এবার আর সান্ত্বনায় কুলোচ্ছে না।

ম। ব্যাপারটা কি, বলই না?

হ। উকিলে চিঠি দিয়েছে।

ম। কেন?

হ। বছর পাঁচেক আগে শ দুই টাকা ধার করেছিলাম—সুদে আসলে সাড়ে তিন শ'য়ে দাঁড়িছে। সাত দিনের মধ্যে দিতে না পারলে নালিশ করবে।

ম। ওঃ, এই কথা। তা একটা কিস্তিবন্দি ক'রে ফেল না!

হ। তাতে সে রাজি নয়।

ম। রাজি না হয়ে তার উপায় কি? টাকা ধার দিয়েছে, আবার কিস্তিবন্দি করবে না, ইয়ার্কি? নালিশ করলে কোর্টও তো কিস্তিবন্দির ব্যবস্থাই করবে।

হ। অনেক বলেছি, কিছুতেই রাজি হয় না।

ম। লোকটা কে হে ?

হ। তুমি চিনবে না।

ম। বলই না, লোকটা কে ?

হ। রাম চাটুজ্জে ব'লে একটা লোক ওই ইয়েতে থাকে। চেন ?

ম। খুব চিনি, ওর মত চশমখোর এ তল্লাটে নেই।

৩

রাম। গাড়িখানার কেমন অদ্ভুত বডি, দেখেছ ?

মধু। হ্যাঁ, একেবারে নতুন, নম্বর দেখেছ—সাতচল্লিশ হাজার কত।

রা। এ পাড়ারই কারও গাড়ি মনে হচ্ছে। প্রায়ই এখান দিয়ে যায়।

ম। হ্যাঁ, ভারি সৌখিন লোকের গাড়ি। ও ছ মাসের বেশি একখানা গাড়ি চড়ে না।

রা। তাই তো! কিছু দিন আগেই যেন দেখেছি, লোকটা একখানা বুইক চ'ড়ে যাচ্ছিল।

ম। শুধু বুইক! আমি তো এই ক বছরে বিলিতি, ইটালিয়ান, জার্মান আর আমেরিকান—পর পর অন্তত সাতখানা গাড়ি দেখলুম।

রা। তাই তো লোকটার তো ভারি সখ।

ম। হ্যাঁ, ওর বৈঠকখানা কি চমৎকার সাজানো! কত দেশের কত কিউরিও এনে সাজিয়ে রেখেছে।

রা। বটে!

ম। বারাকপুরে ওর একটা বাগান আছে, তাতে অন্তত পাঁচ শ রকম ফুলের গাছ আছে।

রা। তাই নাকি? এ পাড়ায় এমন একটা লোক আছে, তা তো এত দিন জানতুম না।

ম। কলকাতায় অমনই হয়। কলকাতার লোকের পাড়াপড়শী ব'লে কিছু নেই।

রা। তুমি চেন লোকটাকে?

মধু। খুব চিনি। ওর নাম রাম চাটুজ্জে, ভীষণ খরুচে।

৪

শ্যাম। খাসা গায় তো!

মধু। হ্যাঁ।

শ্যা। ওরা কারা, জান?

ম। ওরা, এশিয়া-সেবা-সমিতির দল।

শ্যা। ওদের মত-টত কিছু তোমার জানা আছে?

ম। কিছু কিছু জানি। এশিয়ার দুঃখে যাদের প্রাণ গলে, তারাই এই সমিতির সভ্য। এশিয়ার দুঃখ ও দৈন্য দূর করাই এদের উদ্দেশ্য।

শ্যা। তা সাইবেরিয়া, মাঞ্চুরিয়া ছেড়ে আমাদের গলিতে হানা কেন?

ম। এ গলিটাও তো এশিয়ারই মধ্যে।

শ্যা। তা বটে!

ম। ওরা বেরিয়েছে গান গেয়ে চাঁদা আদায় করতে— কাম্‌স্‌কাট্‌কায় পাঠাবে। সেখানে বেকার-সমস্যা ভয়ানক প্রবল আকারে দেখা দিয়েছে।

শ্যা। কিন্তু বেকার-সমস্যা কি আমাদের দেশেই কম?

ম। আমাদের দেশটাও তো এশিয়ারই মধ্যে। লজিক পড়েছ?

শ্যা। পড়েছিলাম তো অনেক দিন আগে—ব্যারব্যারা সিলারেণ্ট ডেরিয়াই ফেরিও—

ম। ওতে কুলোবে না। যাক্, গান শোন।

শ্যা। ওরা কেবলই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে গাচ্ছে কেন?

ম। ওবাড়ি থেকে কিছু পাচ্ছে না, বোধ হয়!

শ্যা। ওটা কার বাড়ি, চেন?

ম। খুব চিনি। রাম চাটুজ্জের বাড়ি—ও দেবে চাঁদা! ওটা তো বিখ্যাত কঞ্জুষ।

৫

ননী। আঃ, শরীরটা যেন জুড়িয়ে গেল।

মধু। হ্যাঁ, গঙ্গায় স্নান ক'রে যে কি আনন্দ, তা যারা না করে, তাদের বোঝানো যায় না।

ন। গঙ্গা সত্যই পতিতোদ্ধারিণী।

ম। পতিতোদ্ধারিণী কি না জানি না, তবে স্নান ক'রে শরীরে ও মনে যে অসীম আনন্দ ও তৃপ্তি হয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

ন। এ ঘাটটা যেন নতুন মনে হচ্ছে। সেবারে তো এখানে বাঁধা ঘাট ছিল না।

ম। নতুনই তো। এই মাস কয়েক হ'ল, এখানে লোকে স্নান আরম্ভ করেছে।

ন। বেশ ঘাটটি কিন্তু। কর্পোরেশনকে ধন্যবাদ দিতে হয়।

ম। এ ঘাট কর্পোরেশন তো করে নি—দেখছ না, ওই উপরে কি লেখা রয়েছে?

ন। শ্যামাসুন্দরী ঘাট।

ম। হ্যাঁ, ওঁর ছেলে মায়ের নামে ওই ঘাট ক'রে দিয়েছে।

ন। চেন নাকি ওঁর ছেলেকে?

ম। খুব চিনি। ওঁর ছেলের নাম রাম চাটুজ্জে—ভারি ধর্মপ্রাণ লোক।

৬

বিনয়। টিকেট কিনেছ?

মধু। হ্যাঁ, সে আমি এসপ্ল্যানেড থেকেই কিনে এনেছি?

বি। চ'লে এস, উঃ কি ভীড়!

ম। তা ভীড় হবে না, এর নাম কুম্ভমেলার যাত্রী। একে হরিদ্বার, তায় পূর্ণকুম্ভ।

বি। এখন প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারলে হয়!

ম। তীর্থ করতে একটু কষ্ট স্বীকার না করলে চলবে কেন?

বি। এই দারুণ গ্রীষ্মে থার্ড ক্লাশের গাড়িতে শেষে সর্দিগর্মি হবে না তো?

ম। হ'লেই বা করা যাচ্ছে কি? এত যদি খুঁতখুতি, তবে এ যাওয়াই বা কেন?

বি। না, তাই বলছি। সত্যই কি আর এতটুকু কষ্ট সইতে পারি না?

ম। তবে সোজা চ'লে এস।

বি। আরে, ওই সামনে রেলিঙের পাশে তোমাদের পাড়ার রাম চাটুজ্জে না?

ম। রাম চাটুজ্জে?

বি। হ্যাঁ গো, রাম চাটুজ্জে।

ম। কখনই না।

বি। নিশ্চয়ই।

ম। আচ্ছা, এস একটু এগিয়ে দেখি।

বি। ও, না, আমারই ভুল হয়েছিল।

ম। সে আমি আগেই জানি।

বি। আমার সঙ্গে তো রাম চাটুজ্জের সাক্ষাৎ আলাপ নেই। তুমি চেন নাকি?

ম। খুব চিনি, ও তো একটা পাষণ্ড, ও যাবে কুম্ভমেলায়!

মার্চ, ১৯৩৮

ভাগ্য

১

ভাগ্যবান পিতা।

বড়টি আই. সি. এস., মেজোটি আই. এম. এস., সেজোটি আই. ই. এস.। কিন্তু—

জগতের সকল ব্যাপারের মধ্যেই একটা করিয়া কিন্তু থাকে, এ ক্ষেত্রেও ছিল। এই কিন্তুটি হইতেছে—ছোট ছেলে জগদীশ, কোন এস.-ই নয়। লেখাপড়ায় কোন দিনই মন ছিল না। কোন দিকে কোন সুবিধাই যখন হইল না, তখন একটি আলমারি এবং খান কয়েক বই কিনিয়া হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার হইয়া বসিল। আয় প্রায় শূন্যেই থাকিয়া গেল। দাদাদের শাসন, অবহেলা এবং উপেক্ষা ক্রমশ গা-সহা হইয়া গেল। আর্থিক ব্যাপারে যাহারা নাবালক, তাহাদিগকে অনেক কিছুই সহিতে হয়।

পিতাঠাকুর অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। অক্ষম বলিয়াই বোধ হয় পিতামাতা জগদীশকে একটু অধিক স্নেহের চক্ষে দেখিয়া থাকেন। জগদীশের নিজের যথেষ্ট আপত্তি সত্ত্বেও কর্তব্যবোধেই তাঁহারা বিবাহ দিয়াছেন। দাদাদের মত ছিল না, কারণ যাহার আয় নাই, তাহার আবার বিবাহ কিসের? কিন্তু পিতামাতার মন তাহাতে সান্ত্বনা পায় নাই। বড় ছেলেদের শিক্ষার গুরুভার বহিতে বহিতেই পিতাঠাকুর প্রায় নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছেন। পেন্‌শনের কয়টি টাকা এবং বাড়িখানি ছাড়া আর কোন সম্বলই তাঁহার নাই। কিন্তু তিনটি এমন কৃতী সন্তান যাঁহার, তাঁহার আর ভাবনা কিসের? সংসারে এমন ভাগ্য কয়জনের?

বর্তমানে সকলেই কলিকাতায়। চার ভাই, চার বউ, দাস, দাসী, আয়া, বয়, বাবুর্চি, ড্রাইভার, পিয়ানো, রেডিও, বন্ধু, বান্ধবী, কুটুম্ব, আত্মীয় প্রভৃতি সকলে মিলিয়া একটি ছোটখাটো স্বর্গ রচনা করিয়াছে। সব দিকেই ভরপূর। একটা আনন্দ ও তৃপ্তির সুর দিবানিশি বাড়িটিকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া বাজিতেছে। শুধু সকলের অজ্ঞাতে অতি গোপনে, এস্রাজের একটি ক্ষুদ্র ছেঁড়া তারের মত, জগদীশ ও রমার দৈনন্দিন জীবনটা যেন একটু বেসুরা ঠেকে, কিন্তু সমস্ত বাড়ির আনন্দের ঐক্যতানে তাহা কাহারও কাছে ধরা পড়ে না।

২

বাড়িতে উৎসব। সকলেই ব্যস্ত। জগদীশ ও রমাও ব্যস্ত। আই. সি. এস. দরজায় দাঁড়াইয়া সকলকে আদর-আপ্যায়ন করিতেছেন; মেয়েদের যাতে কোন অসুবিধা না হয়, সেদিকে আই. এম. এস. সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছেন; রান্নাবান্নার আয়োজন ঠিকমত হইল কি না, অতিথি-অভ্যাগতেরা কেহ অভুক্ত রহিল কি না, তাহা দেখিবার ভার আই. ই. এসের উপর। জগদীশও বসিয়া নাই। কলাপাতাগুলি ধোওয়া হইল কি না, রান্না জিনিসগুলি ঢাকিয়া রাখা হইয়াছে কি না, খাওয়ার জায়গায় খুরি গ্লাস প্রভৃতি সাজানো হইয়াছে কি না, প্রভৃতি শত প্রকার খুচরা কাজের মধ্যে নিশ্বাস ফেলিবার সময় তাহার নাই।

বউদের মধ্যে ডিভিশন-অব-লেবার আছে। আই. সি. এস্-পত্নী স্বামীর একান্ত অনুবর্তিনী হইয়া রিসেপ্‌শন কমিটিতে যোগ দিয়েছেন; আই. এম. এস.-পত্নী মেয়েদের লইয়া আসর জমাইয়াছেন; আই. ই. এস.-গৃহিণী ছেলেমেয়েদের আবদার ও প্রয়োজনের তত্ত্ব লইতেছেন; রমা রান্নাঘর ও ভাঁড়ারঘর অঞ্চলেই রাজত্ব করিতেছেন, মাঝে মাঝে

আসিয়া দিদিদের কাছে পরামর্শ ও আদেশ গ্রহণ করিতেছেন এবং সসঙ্কোচে ইনি কে, উনি কে ইত্যাদি প্রশ্ন করিতেছেন।

নৃত্য, গীত, আলাপ-আলোচনা শেষ হইল। ক্রমশ আহারের পালাও মিটিল। অতিথি-অভ্যাগতেরা বিদায় লইলেন।

আই. সি. এস-দম্পতি সহকর্মীদিগকে সঙ্গদান করিবার জন্য তাঁহাদের টেবিলেই আহার শেষ করিয়াছেন; আই. এম. এস. মহাশয় শ্বশুর-সম্পর্কিতদিগের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া তাঁহাদের সহিতই বসিয়া গিয়াছিলেন; আই. ই. এস. মহাশয় অম্বলের রোগী, রাত্রি বেশি হইলে খাওয়াই হইবে না, তাই মার অনুরোধে সন্ধ্যার পরই অল্পস্বল্প যাহা হউক খাইয়া লইয়াছিলেন। বাকি শুধু রমা আর জগদীশ। আই. এম. এস.-পত্নী নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ইহাদিগকে আহার করাইয়া বলিলেন, আমি আর পারছি না। ঠাকুর-চাকরদের ঝামেলাটা তোমরাই মিটিয়ে দিও কিন্তু। রমা বলিল, আচ্ছা, সেজন্য ভাববেন না। আপনি শোন গিয়ে, অনেক রাত হয়ে গেছে।

৩

অনেকদিন পরে। আই. সি. এস. নাগপুরে বদলি হইয়াছেন; আই. এম. এস. কোয়েটায় এবং আই. ই. এস. মাদ্রাজে। কলিকাতায় জগদীশ হোমিওপ্যাথি করিতেছে, রমা দুইটি শিশু-সন্তান লইয়া গৃহস্থালী চালাইতেছে, এবং বৃদ্ধ পিতামাতা কালীঘাট বেলুড়মঠ ঘুরিতেছেন এবং রমা ও জগদীশের সেবায় তৃপ্তিলাভ করিতেছেন। বড় ছেলেদের চিঠিপত্র ক্রমশ বিরল হইয়া আসিতেছে।

বৃদ্ধ একবার সাংঘাতিক অসুখে শয্যাগত হইলেন। জগদীশ দাদাদের নিকট পত্র লিখিল। আই. সি. এস. উত্তর দিলেন, ভয়ানক

ব্যস্ত, এখন কলিকাতায় যাওয়া অসম্ভব; দেখো, যেন বাবার শুশ্রূষার ত্রুটি না হয়। আই. এম. এস. লিখিলেন, বিশেষ চিন্তিত হইলাম; কি অসুখ, ডাক্তারেরা কি বলে, কি কি ঔষধ প্রেস্‌ক্রাইব করা হইয়াছে, সবিস্তারে জানাইবে; আমার এখন ছুটি পাইবার সম্ভাবনা নাই। আই. ই. এস. লিখিলেন, বাবার অসুখের খবর পেয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হলাম; এ সময়ে তাঁর কাছে থেকে একটু শুশ্রূষা করব, তার উপায় নেই; ভয়ানক কাজের চাপ পড়েছে; যখন যেমন থাকেন, লিখতে ভুলো না।

অসুখ বাড়িয়া চলিল। জগদীশ দাদাদের নিকট লম্বা হইতে লম্বাতর পত্র লিখিতে লাগিল। পত্রের উত্তর আসিতে দেরি হইতে দেরিতর হইতে লাগিল।

বৃদ্ধের জীবনদীপ ক্রমশ নির্বাপিত হইল। শেষ সময়ে বড় ছেলেদের কাছে না পাইয়া শেষ নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় দুইটি অশ্রুবিন্দু গণ্ডদেশ বাহিয়া পড়িল।

শ্মশানকৃত্য শেষ করিয়াই জগদীশ দাদাদের নিকট তিনখানি টেলিগ্রাম করিল। ঠিক তিন দিন পরে একই দিনে মাদ্রাজ মেল, বোম্বে মেল এবং পাঞ্জাব মেল যোগে তিন দাদা বাড়ি ফিরিলেন। সঙ্গে একজন করিয়া আরদালি।

অসুখ এবং মৃত্যুর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়া জগদীশ বলিল, একটু বিশ্রাম ক'রে তোমরা স্নান ক'রে নাও। আমি কাছা কাপড় এনে দিচ্ছি। তিনজনেই বলিলেন, আমাদের দুই এক দিনের মধ্যেই ফিরে যেতে হবে, কাজেই ওসব ঝামেলা আর করব না।

সেকি! শেষ কৃত্যটার ব্যবস্থা ক'রে যাবে না?

সে তুই যা হয় করিস। আমাদের সময় হবে না।

জগদীশ অবাক হইয়া দাদাদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। আই. সি. এস. বলিলেন, কিছু মনে করিস না ; আমাদের যে সব কাজ, তাতে ওসব সেকেলে নিয়ম-টিয়ম মানা চলে না। সে যাক—আচ্ছা, বাবা উইল-টুইল কিছু করেছেন ?

হ্যাঁ, করেছেন।

নিয়ে আয় তো ?

এই তো সবে তোমরা গাড়ি থেকে নেমে এলে। একটু জিরিয়ে নাও। মুখ হাত ধোবে ? জল এনে দিতে বলি ?

ওসব আমরা গাড়ি থেকেই সেরে এসেছি। যা, উইলখানা নিয়ে আয়।

উইলখানা আনিয়া জগদীশ দাদাদের হাতে দিল। উইল পড়িয়া আই. সি. এস. বলিলেন, ব্যাপার কি ?

জগদীশ সভয়ে বলিল, আমি তো এখনও উইলখানা প'ড়ে দেখি নি। অসুখ হবার পরই বাবা উইল ক'রে সিন্দুকে রেখে দিয়েছিলেন। এই সিন্দুকের চাবি।—বলিয়া জগদীশ চাবির রিংটা দাদার হাতে দিয়া দিল।

থাক, আর ন্যাকামি করতে হবে না। তুই এখন একটু বাইরে যা তো।

জগদীশ বাহির হইয়া গেল। বাড়ির ভিতরে গিয়া মাকে এবং স্ত্রীকে সব কথা বলিল। সদ্যবিধবা মাতা কোন কথা বলিলেন না। রমা বলিল, ওঁরা যা ইচ্ছে করুন, তুমি কোন কথা ব'ল না।

বাহিরের ঘরে তিন দাদা মিলিয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন। উইলে ছিল—বাড়ির জিনিসপত্র, গহনাপত্র, থালা-বাসন প্রভৃতি সমস্ত জিনিস চার বধূ সমান ভাগ করিয়া লইবেন। লাইফ ইন্‌সিওরের সামান্য টাকা যাহা ছিল, তাহা মাতাঠাকুরাণী পাইবেন এবং বাড়িখানির অর্ধেক

ছোট ছেলে জগদীশ পাইবে। অন্য অর্ধেক দাদাদের থাকিবে। অন্তত মাথা গুঁজিবার স্থান একটু না থাকিলে প্রায়-বেকার জগদীশ কোথায় দাঁড়াইবে, ইহা ভাবিয়াই বৃদ্ধ পিতা একান্ত সেবাপরায়ণ কনিষ্ঠ পুত্রকে তাহার প্রাপ্য বাড়ির সিকি অংশ হইতে একটু বেশি দিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু যাহার প্রাপ্য সিকি, সে কেন অর্ধেক পাইবে, তাহা আই. সি. এস., আই. এম. এস. এবং আই. ই. এস. তিনজনে মস্তিষ্ক একত্র করিয়াও বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। সুতরাং স্থির হইল, উইল নষ্ট করিয়া ফেলিতে হইবে।

আই. সি. এস. জগদীশকে ডাকিয়া বলিলেন, বাবার উইল তুই নিজের সুবিধেমত লিখিয়ে নিয়েছিস, তাই আমরা ওটা মানতে রাজি নই। এই পুড়িয়ে ফেললুম।—বলিয়া পকেট হইতে দেশলাই বাহির করিয়া উইলখানা পুড়াইয়া ফেলিলেন।

যা করবে, দুদিন পরে করলে চলত না? মার কান্নাও যে এখন থামে নি!

৪

দুই দিন পরে। দাদাত্রয় জগদীশকে ডাকিয়া বলিলেন, আমরা সব বন্দোবস্ত ঠিক ক'রে ফেলেছি। কাল বিকেলে আমরা ফিরে যাব।

কি ঠিক করলে? একটা দানসাগর করলে হ'ত না? বাবার বোধ হয় মনে মনে ঐরকম একটা ইচ্ছে ছিল। বিশেষত তোমরা সব আসবার পর থেকে পাড়ার লোকেও সব বলাবলি করছিল।

আমরা ওসব বন্দোবস্তর কথা বলছি না। ও তুই যা হয় করিস। আর বাবার মৃত্যু নিয়ে একটা হৈচৈ করা আমাদের মত নয়। এ তো

আর বিয়ে-থা নয়। একটা পুরুত ডেকে গোটা আড়াই টাকা ফুরন ক'রে দিস, সেই যা হয় করবে' খন।

এই কথা বলিয়া আই. সি. এস. স্বীয় পার্স হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া আই. এম এসের দিকে চাহিলেন; আই. এম. এস-ও আর একটি টাকা বাহির করিয়া আই. ই. এসের দিকে চাহিলেন; আই. ই. এস. বাকি আট আনা বাহির করিয়া আড়াই টাকা একত্র করিয়া জগদীশের হাতে তুলিয়া দিলেন। জগদীশ কাঠের পুতুলের মতই দাদাদের হাত হইতে আড়াই টাকা লইয়া রাখিল।

আই. সি. এস. বলিলেন, আমরা সব ঠিক ক'রে ফেলেছি। অ্যাটর্নি মিঃ মুখার্জির ওপর সব ভার রইল। তিনি এ বাড়িখানা বিক্রি ক'রে তাঁর নিজের খরচপত্র কেটে নিয়ে যা থাকে, সেটা চার ভাগ ক'রে আমাদের চার ভাইকে পাঠিয়ে দেবেন। শ্রাদ্ধটা পর্যন্ত তুই এখানে থাকতে পারিস। তার পরে বাড়িটা খালি ক'রে দিতে হবে। আমরা কালই রওয়ানা হচ্ছি।

সেই দিনই। রাত্রি প্রায় বারোটা। দাদারা ঘুমাইয়াছেন। দুইখানি ট্যাক্সি আসিয়া দরজায় দাঁড়াইল। গোটাকয়েক বিছানা, বাক্স এবং কিছু বাসনপত্র গাড়িতে বোঝাই হইল। ইহার পর জগদীশ রমার হাত ধরিয়া এবং তাহার মাতাঠাকুরাণী দুইটি নাতি ও নাতনীর হাত ধরিয়া গাড়িতে উঠিলেন। পিতার সদ্য-মুক্ত আত্মাটিও সঙ্গে গেলেন কি না, কে জানে!

সকালে দাদাত্রয় চাকরদের জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাপার কি? চাকরেরা সঠিক সংবাদ দিল। তিনজনেই বলিয়া উঠিলেন, জগাটা চিরকালই একটা গোঁয়ার!

অক্টোবর, ১৯৩৯

রোয়াক

সান্ন্যাল মহাশয়ের রোয়াক এ পাড়ায় প্রসিদ্ধ। আজ প্রায় বিশ বৎসর যাবৎ এই রোয়াকের কোণে প্রাতে পাঁচটা পঁয়ত্রিশ মিনিটের সময়ে নিমের দাঁতন সহযোগে উৎপন্ন সান্ন্যাল মহাশয়ের কণ্ঠনিঃসৃত ওয়াক্-ওয়াক্ শব্দ শুনিয়া প্রতিবেশীরা ঘড়ি মিলাইয়া আসিতেছে।

কতকগুলি জিনিসের স্বত্ব প্রাইভেট এবং তাহার ব্যবহারও প্রাইভেট; যেমন, নিজের গায়ের জামা। কতকগুলি জিনিসের স্বত্ব সাধারণের এবং ব্যবহারও সাধারণেই করিয়া থাকে, যেমন, কলেজ স্কোয়ার। আবার কতকগুলি জিনিস আছে, যাহার স্বত্ব প্রাইভেট হইলেও ব্যবহার সর্বসাধারণে করিয়া থাকে; যেমন, রোয়াক— ফুটপাথের পার্শ্বে, সরু, লম্বা, রেলিং-বিহীন সিমেণ্ট দিয়া গাঁথা, দুই হইতে পাঁচ ফুট উচ্চ স্থলভাগকে 'রোয়াক' বলা হইয়া থাকে। কেহ কেহ ইহাকে 'রক'ও বলিয়া থাকেন। এই পাড়ার এই জিনিসটি যে সান্ন্যাল মহাশয়ের নিজস্ব, সে সম্বন্ধে কাহারও মনে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা ব্যবহার করে সর্বসাধারণে। এই জাতীয় দ্রব্য পৃথিবীতে অতিশয় দুর্লভ। সুতরাং রক হীরকের সহিত তুলনীয়।

সান্ন্যাল মহাশয় একদিন মুখ ধুইয়া বাড়ির ভিতর যাইবার সময়ে দেখিলেন, রোয়াকের অপর পার্শ্বে দুইটি ছাগল শুইয়া আছে। তাহাদিগকে নিজেই তাড়াইয়া দিলেন, কারণ তাঁহার নিজস্ব রোয়াকের উপর অন্যের ছাগল থাকিবে কেন? কিন্তু প্রাতে বিতাড়িত হইলেও ছাগলগুলির রাত্রিবাসের যে কোন অসুবিধা হয় নাই, তাহা বলাই

বাহুল্য। সান্ন্যাল মহাশয়ের চাকর কেষ্ট আসিয়া নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও রোয়াকটি ভাল করিয়া পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া দিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে হয়তো পাশের বাড়ির ঝি দেড় বছরের একটি শিশু লইয়া রোয়াকে আসিয়া বসিল এবং রাস্তার ওপারের দিব্যেন্দুসুন্দরের প্রিয় কুকুরটি রোয়াকে আসিয়া শিশুটির সহিত খেলা জুড়িয়া দিল। কিছুক্ষণ পরে উভয়ের অন্তর্ধানের পর রোয়াকের যে অবস্থা দেখা গেল, তাহাতে কেষ্টর দ্বাদশ বৎসরের ধৈর্যও বিনষ্ট হইল। সান্ন্যাল মহাশয় অনেক কষ্টে তাহাকে রেজিগ্‌নেশন হইতে নিরস্ত করিলেন।

কোন ফেরিওয়ালা বাটির সম্মুখে আসিলে সাধারণত জিজ্ঞাসা করিয়াই চলিয়া যায়। কিন্তু রোয়াক পাইলে আর কথা নাই। সেখানে সে ঝাঁকা নামাইবেই; বিক্রয় না হউক, বিশ্রাম তো হইবে। সুতরাং কাপড়, জামা, আঙুর, বেদানা, মাছ, ডিম, পুতুল, আল্‌তা, চুলের ফিতা, বাসন, আল্‌না, টিপয়, যে কোন জিনিসের ফেরিওয়ালাই হউক না কেন, সে সান্ন্যাল মহাশয়ের রোয়াকে জিনিস নামাইবেই এবং যখন বিশ্রাম করিতেই হইল, তখন একটু পরিশ্রম করিয়া, দরজায় ধাক্কা দিয়া, চাকরকে ডাকিয়া, খোকাখুকীকে ভুলাইয়া, মাঠাকরুণের মন গলাইয়া, দুই একটা জিনিস গছাইবার চেষ্টা করিলে ক্ষতি কি? সুতরাং ক্রমাগত দরজা-ধাক্কা, তর্কাতর্কি, বচসা, অনুনয়-বিনয় এবং মধ্যে মধ্যে, ক্রয়-বিক্রয় —এ দৃশ্য সান্ন্যাল মহাশয়ের রোয়াকে প্রতিদিনই অভিনীত হইয়া থাকে।

দুপুরে দেখা যায়, একটা ঝাঁকামুটে ঝাঁকা-ঠেস দিয়া ঝিমাইতেছে, একটি সেলাই-বুরুস তাহার থলি মাথায় দিয়া ঘুমাইতেছে, একটি ভিখারিণী বৃদ্ধার শ্রান্ত দেহ এলাইয়া পড়িয়াছে, বাসনওয়ালার বিরাট বোঝা নামাইয়া কুলীটি একটি সিগারেট টানিতেছে, পাশে যে নূতন

বাড়িটা প্রস্তুত হইতেছে, তাহারই দুইটি মজুর এক ঘটি জল ও এক থালা চিড়া লইয়া এক পাশে বসিয়াছে, আর বিপরীত দিকে সান্ন্যাল মহাশয়ের বৃদ্ধ কুকুরটি জিভ বাহির করিয়া হাঁফাইতেছে।

বৈকালের দিকে কেষ্ট আর একবার রোয়াকটি পরিষ্কার করিয়া দিয়া যায়। সান্ন্যাল মহাশয় তাহার নাতি-নাতিনীদের লইয়া একটু বসেন, হয়তো বসেনও না, এবং রাস্তার ফুটপাথে পায়চারি করেন। সেদিন গিয়াছিলেন পার্কে বেড়াইতে, ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, রোয়াকের উপর খড়ি দিয়া লেখা, 'Dear Ramu, you must do friendship with me; if not, I kill you.' এই অ্যাপাশি বন্ধুত্বের আভাস পাইয়া সান্ন্যাল মহাশয় তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রামুকে সাবধান করিয়া দিলেন। পরদিন দেখা গেল, সেখানে লেখা, 'Ramu boycott.' রোয়াকে সন্ধ্যা নামে। পাড়ার দুইটি রসিক ছোকরা আসিয়া বসে। একজন রোয়াকের উপরে আঙুল দিয়া তাল ঠোকে, অপরে গায়—

আকাশে চাঁদ ছিল রে—

সান্ন্যাল মহাশয় কিছুক্ষণ শোনেন, তারপর কেষ্টকে বলেন, ওদের বল, আজ আর না, ছেলেদের এগ্‌জামিন। গায়ক রসিক, কাণ্ডজ্ঞান আছে, উঠিয়া চলিয়া যায়।

আবার হয়তো আসে নিমাই, খাসা বাঁশী বাজায়। রোয়াকের কোণে বসিয়া যখন বাজাইতে থাকে, তখন পাড়াসুদ্ধ লোক কান পাতিয়া শোনে। কিন্তু উপর্যুপরি পনেরো দিন বাঁশী শুনিবার পর সান্ন্যাল মহাশয়ের গৃহিণী বলেন, তুমি বাঁশী নিয়ে থাক, আমি ছেলেপুলে নিয়ে স'রে পড়ি। বিব্রত সান্ন্যাল মহাশয় অনুনয়-বিনয় দ্বারা নিমাইকে বংশীবাদন হইতে এবং গৃহিণীকে পিত্রালয়-গমন হইতে নিরস্ত করেন।

রাত্রে আহারাদির পর একদিন দেখা গেল, দুইটি লোক রোয়াকের একপার্শ্বে আসিয়া শুইয়া আছে। ইহাতে নূতনত্ব নাই। এমন তো প্রায়ই দেখা যায়। প্রাতে দেখা গেল, সান্যাল মহাশয়ের ভাঁড়ার ঘর প্রায় শূন্য। অনুসন্ধানে জানা গেল, অধিক রাত্রে ঐ লোক দুইটি কেষ্টর কাছে দিয়াশলাই চায় এবং তামাক ইত্যাদি সেবনে রত হয়। অধিকতর অনুসন্ধানে প্রকাশ হয় যে কেষ্টর কোমরের চাবিছড়া অন্তর্হিত হইয়াছে।

কয়েকদিন পূর্বের কথা বলিতেছি। সন্ধ্যার পর সান্যাল মহাশয় সন্ধ্যায় বসিয়াছেন। নাতিনী রেবা রঘুবংশ মুখস্থ করিতেছে। সেই ঘরের পাশেই রোয়াকের উপর দুইটি লোক আসিয়া বসিল। তাহারা সিগারেট খাইতেছে, নিম্নস্বরে কথা বলিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে ঘরের দিকে উঁকি দিতেছে। রেবা ভয় পাইয়া বাড়ির মধ্যে গিয়া কেষ্টকে বলিল। কেষ্ট বাহিরে আসিয়া লোক দুইটিকে চলিয়া যাইতে বলিল। লোক দুইটি নড়িল না। কেষ্ট সান্যাল মহাশয়কে গিয়া বলিল, তিনিও বাহিরে আসিলেন এবং উহাদিগকে চলিয়া যাইতে বলিলেন, তাহারা বলিল, এখানে বসেছি, তাতে হয়েছে কি? কেষ্ট বলিল, যাই হোক, এখানে বসবেন না।

নিশ্চয় বসব।

এখানে বসতে পারবেন না, উঠে যান।

যাব না।

এই কথায় কেষ্টর ধৈর্যচ্যুতি হইল। সান্যাল মহাশয় বারণ করিবার পূর্বেই সে উহাদের একজনকে গলাধাক্কা দিয়া রকের নীচে ফেলিয়া দিল; কিন্তু পরমুহূর্তেই দ্বিতীয় ব্যক্তির ছুরিকাঘাতে আহত হইয়া চীৎকার করিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িল। লোক দুইটি পলায়ন করিবার সময়ে সান্যাল মহাশয়কেও শাসাইয়া গেল।

কেষ্ট এখনও হাসপাতালে, অবস্থা সঙ্কটাপন্ন।

এখন প্রত্যহ বৈকালে পাড়ার লোকে রোয়াকে আসিয়া বসেন এবং সান্ন্যাল মহাশয়কে অভয় দেন।

তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সান্ন্যাল মহাশয়কে পরামর্শ দিতেছেন, আপনি রোয়াক ভাঙিয়া ফেলুন, এবং এখানে ফুলের গাছ পুঁতুন। এ পাড়ার কর্পোরেশনের কাউন্সিলর বিল্ডিং-কমিটীতে রোয়াক-নির্মাণ বন্ধ করিবার প্রস্তাব আনিবেন বলিয়া মনস্থ করিয়াছেন।

সান্ন্যাল মহাশয়ের নাকি তাহাতে মত নাই। বহুদিনের প্রিয় বস্তু কেহ সহজে ত্যাগ করিতে সম্মত হয় না।

নভেম্বর, ১৯৩৭

মোচার ঘণ্ট

কথা

দেখ রবি, তোর বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে, বুঝলি ?

যাও।

এবার আর 'যাও' না, সত্যি সম্বন্ধ হচ্ছে।

তোমাকে তো বলেছি দিদি, ওসব আমার দ্বারা হবে না।

ওসব কথা আর ওসব তর্ক তো পুরোনো হয়ে গেছে। এবার আর তর্কাতর্কি নেই।

কি যে বল, তার ঠিক নেই।

বেশ, আর কদিন পরেই টের পাবি।

তোমরা এমন ক'রে আমার পেছনে কেন লাগলে বল তো ?

সবার পেছনেই সবাই এমন ক'রেই লাগে।

যাও।

তা যাচ্ছি, কিন্তু প্রস্তুত হয়ে থাকিস।

আচ্ছা, কোথায় সম্বন্ধ হচ্ছে শুনি ?

তোর তো মতই নেই, তা কোথায় কার সঙ্গে, এসব শুনে আর কি হবে ?

তবু শুনিই না, কাকে দেখে তোমরা ম'জে গেলে।

যার বিয়েতেই মত নেই, তার পক্ষে এসব কৌতূহল অস্বাভাবিক।

বেশ, ব'ল না। আমি কালই এখান থেকে চ'লে যাচ্ছি।

কোথায় যাবি ?

জানি না, তবে এখানে থাকব না।

কেন ?

আমার ইচ্ছে।

আচ্ছা, শোন তবে। সম্বন্ধ হচ্ছে ওই ঘোষেদের মাধুরীর সঙ্গে। ওর বাবা বড্ড ধ'রে পড়েছে। মেয়েটিও তো বেশ, এবার আই. এ. দেবে।

ওরে ব্বাপ !

মানে ?

ওই ঘোড়ায় চড়া মেয়ে ? তোমাদের পছন্দের বাহাদুরি আছে।

ঘোড়ায় চড়া মানে ?

ওই তো দুবেলা মোটর হাঁকিয়ে বেড়ায়, গাড়ির সঙ্গে ম্যাচ ক'রে শাড়ি পরে, সন্ধ্যে হ'লেই হারমোনিয়ম নিয়ে বসে—

বসলই বা।

আমার তো মোটর নেই, কোনদিন কিনবও না।

করবি বিয়ে, এর সঙ্গে মোটর থাকা না থাকার কি সম্বন্ধ আছে ?

আছে বইকি। ওসব মেয়ের কখনও ঘরকন্নায় মন বসে ?

কি ক'রে জানলি ?

দেখেই বোঝা যায়।

ছাই বুঝেছিস। মেয়েটি কেমন সরল, কি মিষ্টি কথা ! ও মেয়ে যদি স্বামীকে সুখী করতে না পারে তো কেউ পারবে না। গাড়ি আছে, সখ আছে, তাই গাড়ি চালায়; না থাকে, চড়বে না। সে তেমন মেয়েই নয় যে, গাড়িটাকেই সর্বস্ব মনে করবে। তা কেউই করে না। তোর মনের ওসব আজগুবি ধারণা এখন চাপা থাক। বিয়েটা হয়ে যাক, তারপর যত খুশি ভাবিস ব'সে ব'সে।

যাই বল দিদি, বিয়েটিয়ে আমি করব না।

আচ্ছা, ও মেয়ে পছন্দ না হয়, অন্য মেয়ে দেখা যাবে। বিয়ে কিন্তু ঠিক।

তোমরা কি গায়ের জোরে আমার বিয়ে দেবে নাকি?

দোষ কি?

সত্যি, তোমরা বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছ।

এ আর কদিন? বিয়েটা একবার হয়ে গেলে আর কেউ কোন কথা বলবে না।

যাই কর, ওসব মাধুরী-টাধুরীর ভাবনা ছাড়, বুঝলে?

আমরা না ভাবলে কি হবে? ওদিক থেকে যে ভাবনা স্থরু হয়ে গেছে।

ওদিক থেকে মানে?

মেয়ে যে স্বয়ম্বরা হতে চায়।

ওরে ব্বাপ!

তা কি করা যাবে বল? তোদের যেমন পছন্দ-অপছন্দ আছে, মেয়েদের বুঝি পছন্দ-অপছন্দ নেই? মাধুরীর নাকি তোকে ভারী পছন্দ। আর আমাদের তো পছন্দ হয়েই আছে। স্থতরাং—

স্থতরাং?

স্থতরাং শুধু শুভদিনের অপেক্ষা।

দেখ দিদি, আমারও একটা মতামত আছে। বিয়ে আমি করব না, স্পষ্টই তোমাদের বলেছি। নেহাৎ যদি করতেই হয়, তবে রান্না-বান্না-জানা স্থির ঠাণ্ডা মেয়ে-টেয়ে দেখ। ওসব মোটর হাঁকানো মেয়ের চিন্তা মন থেকে হাঁকিয়ে দাও।

মেয়েটি কিন্তু বড্ড ভাল রে রবি।

আবার সেই এক কথা! আমার যা বলবার তা বলেছি। আমার অমতে কিছু করতে যেও না দিদি, অনর্থ হবে।

আমাদের জগন্নাথ ঠাকুরের একটা ভাইঝি আছে, বেশ রান্না জানে, বালেশ্বর জেলায় বাড়ি। দেখি একবার খোঁজ ক'রে—কি বলিস ?

চিন্তা

শ্রীমান রবি ভাবিতেছে। লেকের দক্ষিণ ধারে একটা টিলার উপর বসিয়া রবি ভাবিতেছে, রেল-লাইনের ওপার হইতে এক 'পিলেট' আলুর চপ আনাইয়া একটু একটু করিয়া খাইতেছে আর ভাবিতেছে—

আচ্ছা, মাধুরী মেয়েটা নেহাৎ মন্দই বা কি ? সুন্দরী অবশ্য নয়। নাঃ, ওসব গাছে চড়া মেয়ে দূর থেকেই দেখতে ভাল ; কাজ নেই ওসব রিস্কের মধ্যে গিয়ে, শেষে যদি সামলানো না যায়। কিন্তু বিয়ে হয়ে গেলে অত দুরন্তপনা নাও থাকতে পারে, ঘরকন্নার দায়িত্ব বা ইচ্ছে বা সখ, সে তো দুজনেরই সমান হবে। তখন আপনি সব ঠিক হয়ে যাবে। নাঃ, সে কি আর হয়! কথায় আছে, স্বভাব যায় না ম'লে। কাজ নেই ওসব। মেয়েটা কিন্তু বেশ জলি। শেষে আবার মুখ-গোমড়া ছিঁচকাঁদুনে একটা না এসে জোটে। বলা যায় না। শেক্সপীয়র বলেছেন, Wiving and hanging go by destiny। তবু মন কিন্তু সরে না। দিনরাত ধেই ধেই ক'রে বেড়ানো যার অভ্যেস হয়ে গেছে, তাকে ঘরে পোষ মানানো সহজ হবে না। তা ছাড়া মেয়ের তো অভাব নেই। নাই বা হ'ল মাধুরী। কিন্তু সে আবার নাকি আমাকে পছন্দ করেছে। আচ্ছা, তার পছন্দের কোন মূল্য আছে ? বিয়ের আগে কাকেও পছন্দ করাটা ছেলেদের পক্ষে শোভন হতে পারে, মেয়েদের পক্ষে ওটা ভারী অন্যায়! সে ন্যায়ই করুক আর অন্যায়ই করুক, তাতে তো কিছু আসে যায় না। আমার যখন মত নেই, তখন

তার মত আছে বা না আছে, তা আমার জানার দরকার কি? আমি যদি মত না দিই, তা হ'লে হয়তো সে খুব দুঃখ পাবে, আমার তাতে ব'য়েই গেল।

'পিলেট' এবং দাম লইয়া বয় চলিয়া গেল। মুখ মুছিয়া সম্মুখে চাহিতেই শ্রীমান রবি দেখিতে পাইল, অদূরে একখানি চেনা গাড়ি। মাধুরীর গাড়িই তো! কিন্তু লোক কই? খানিকক্ষণ এদিক ওদিক চাহিয়া কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া যেন নীরবে অজ্ঞাতসারেই রবি ধীরে ধীরে গাড়িখানির কাছে গিয়া পড়িল। গাড়িখানি খালি, কিন্তু স্টীয়ারিং-চাকার উপর একখানা বই আধখোলা অবস্থায় উপুড় করা রহিয়াছে। রবি ভাবিল, নিশ্চয়ই একখানা আধুনিক উপন্যাস বা কবিতার বই হইবে। কিন্তু একটু লক্ষ্য করিতেই দেখিতে পাইল, উপন্যাসও নয়, কবিতাও নয়, একখানি 'পাক-প্রণালী'। বইখানি হাতে লইয়া খোলা জায়গাটি পড়িয়া দেখিতে পাইল—"মোচার ঘণ্ট"। রবি আশ্চর্য্য হইয়া গেল। বইখানি যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া নিজ টিলার উপর আসিয়া গালে হাত দিয়া আবার ভাবিতে লাগিল। একটু পরেই দেখা গেল, জলের ধার হইতে ফিরিয়া আসিয়া মাধুরী মোটরে উঠিয়া বোঁ করিয়া লেকের পূর্বদিকে চলিয়া গেল।

শ্রীমান রবি ভাবিতেছে—

আচ্ছা, তা হ'লে ওর রান্নারও সখ আছে, দেখছি। তাই তো, যে মোটর হাঁকায়, সে আবার রাঁধেও! তাও কাট্‌লেট নয়, পুডিং নয়, কোর্মা নয়, কোপ্তা নয়, একেবারে নিরামিষ মোচার ঘণ্ট! তাই তো, ভাবিয়ে তুললে দেখছি। বোধ হয়, দিদির পছন্দটাই ঠিক। নাঃ, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না; স্টীয়ারিং-চাকার উপরে 'পাকপ্রণালী'—একটা পোজ নয় তো? কে জানে ওদের মনে কি? বই, স্কুল, হোস্টেল,

একৃজামিন, বন্ধুবান্ধব, নাটক, নভেল, থিয়েটার, বায়োস্কোপ প্রভৃতির ভেতর দিয়ে যাদের জীবনের সব কিছুই শেখা হয়ে গেছে, তাদের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। আচ্ছা, ছেলেরাও অর্থাৎ আমরাও তো ওই সমস্তর ভেতর দিয়ে সব শিখেছি, তাতে আমরা তো ব'য়ে যাই নি, সুতরাং মেয়েদের বেলায়ই—। আসল কথা; ছেলেদের আর মেয়েদের বেলায় ভিন্ন নিয়ম, আমাদের একটা বদ অভ্যাস হয়ে গেছে। এই বদ অভ্যাসটা দূর করতে না পারলে—। দূর হোক গে ছাই।

কাজ

কিছুদিন হইল, সালঙ্কারা, সাড়ম্বরা, সমোটরা শ্রীমতী মাধুরী শ্রীমান রবির গৃহে নির্বিঘ্নে এবং নিরাপদে অধিষ্ঠিতা হইয়াছেন।

শ্রীমান মোটর-ড্রাইভিং শিখিতেছেন। শ্রীমতী রান্নাবান্না শিখিতেছেন।

একদিন দুপুরের পর অনেকক্ষণ ড্রাইভিং অভ্যাসের পর পথে মোটরের কল বিগড়াইয়া যাওয়ায়, গাড়ি ঠেলা, গায়ে হাতে কালি মাখা প্রভৃতি নানাবিধ কর্তব্য সম্পন্ন করিয়া শ্রান্ত হইয়া বাড়ি ফিরিয়াই শ্রীমান দিদিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বউ কোথায়?

হেঁসেলে।

হেঁসেলে কেন?

তোর জন্যে খাবার করছে।

হেঁসেলে যেতে বারণ করেছি না?

সেকি? রান্না-বান্না করবে অথচ হেঁসেলে যাবে না, তার মানে? এরই জন্যে তো তুই বিয়েই করতে চাস নি।

রান্নাবান্না জানবে, তাই চেয়েছিলুম। তাই ব'লে সত্যিই তো আর র্াঁধতে বলি নি।

ও! তোর মনের কথা কেমন ক'রে বুঝব বল?

ইতিমধ্যে শ্রীমতী এক হাতে লুচি, বেগুন-ভাজা আর মোচার ঘণ্ট এবং অন্য হাতে চা লইয়া উপস্থিত হইলেন। দিদি সরিয়া গেলেন। শ্রীমতী একখানি টিপয়ের উপর খাবার নামাইয়া রাখিয়া বলিলেন, কি হচ্ছিল এতক্ষণ?

শ্রীমান গাড়ি-সংক্রান্ত বিবরণ সংক্ষেপে বিবৃত করিলেন। শ্রীমতী কহিলেন, তোমার তো কোন দিনই গাড়ির বাতিক ছিল না, এখন এসব আরম্ভ করেছ কি?

এখন তো বেশ ভালই লাগে দেখছি। আচ্ছা, তোমার ব্যাপারটা কি বল তো? হাত ধোয়া নেই, পা ধোয়া নেই, কাপড় ছাড়া নেই, চুল বাঁধা নেই, এতক্ষণ পর্যন্ত হেঁসেলে গিয়ে ব'সে আছ কেন?

তোমার জন্যে খাবার করছিলুম। র্াঁধতে আমার বেশ লাগে। মোচার ঘণ্টটা কেমন হয়েছে? আজ এই প্রথম র্াঁধলুম।

খাসা হয়েছে! কিন্তু প্রথম র্াঁধলে মানে? সেই—সেদিন যে লেকে তোমার গাড়িতে দেখেছিলুম, 'পাক-প্রণালী'তে মোচার ঘণ্টর পাতা খোলা।

সেটা একটা পোজ—দিদি শিখিয়ে দিয়েছিলেন! সেদিন যেটা পোজ ছিল, আজ সেটা এমন আপন, এমন সত্যি হয়ে উঠবে, তা আমিও ভাবতে পারি নি। কেন এমন হয় বল তো? তুমি মোটর দুচক্ষে দেখতে পারতে না, এখন দেখছি এই মোটরই আমার সতীন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এমন ক'রে মত বদলায় কেন বল তো?

মালাবদলের আসল মানে হচ্ছে, মত-বদল। এখন বুঝতে পারছি,

পরস্পরের মত-বদলাবদলি হয় ব'লেই শ্রীমান এবং শ্রীমতীরা বিয়ের পরে সব বদলে যান।

সত্যি, আমার কিন্তু ভারী আশ্চর্য বোধ হয়।

ইতিমধ্যে দিদি আসিয়া পড়িলেন। বারান্দায় দেওয়ালের আড়ালে দাঁড়াইয়া ছিলেন না তো? আশ্চর্য নয়। তিনি আসিয়াই বলিলেন, ভারী আশ্চর্য বোধ হয়, না? বই, স্কুল, কলেজ, হোস্টেল, বন্ধুবান্ধব—এত সব দেখে, শুনে, প'ড়ে, তবু এইটুকুতেই আশ্চর্য হয়ে গেলি? এবার বুঝেছিস বোধ হয়, বিয়ে না হ'লে সংসারের অনেক কিছুই এমনই অজানা থেকে যায়। মাথার ঘিলু বেশি শক্ত হয়ে গেলে কিন্তু আর মত-বদলাবদলিও হয় না, আশ্চর্য হবার মত কিছু থাকেও না। নে, তোর চা যে এদিকে ঠাণ্ডা হয়ে গেল!

তারপর

তারপর আর কি? কয়েক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। একদিন বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রীটের মোড়ে একটা দোকানের সামনে গাড়ি থামিতেই, শ্রীমানের কৌমার্যযুগের একটি পুরাতন বন্ধুর সঙ্গে হঠাৎ সাক্ষাৎ হইল। গাড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি বলিলেন, একি, বিয়ে করেছিস নাকি? তোর তো বিয়েতে মত ছিল না।

এখনও নেই।

উভয়েই হাসিয়া উঠিলেন। বন্ধুটি দেখিলেন, শ্রীমতীর শাড়ি অথবা লীলা, ইলা এবং শীলার ফ্রক, কোনটিই গাড়ির সঙ্গে ম্যাচ করে নাই, কিন্তু মেয়ে কয়টির মুখের সঙ্গে শ্রীমতীর তৃপ্ত, স্নিগ্ধ, সুকোমল মুখখানি আশ্চর্যরূপে ম্যাচ করিয়াছে।

জানুয়ারী, ১৯৩৯

জাগরণ

১

প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া খবরের কাগজ হাতে করিয়া রামহরিবাবু হাঁকিলেন, ওগো, শুনছ ?

কি ?

আমি জেগেছি।

তা তো দেখতে পাচ্ছি। যাচ্ছি ঠাকুরের পায়ে দুটো ফুল দিতে। তারপরই দিচ্ছি চা পাঠিয়ে। একটুখানি সবুর কর।

চা কে চাচ্ছে ? বলছি, আমি জেগেছি।

বলছি তো, আমি তা দেখেছি।

কিচ্ছু দেখ নি। সত্যি বলছি, আমি আজ জেগেছি। অন্য দিন আগে জাগি, তারপর খবরের কাগজ পড়ি, কিন্তু আজ ঠিক তার উল্টো। আগে খবরের কাগজ পড়েছি, তারপরে জেগেছি। অন্য দিনের জাগাটা নিতান্তই শারীরিক, আজকের জাগাটা মানসিক— আধ্যাত্মিকও বলতে পার।

কি যে বলছ, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

সত্যি কথাই বলছি। এই সত্তর বছর শুধু ঘুমিয়েই কাটিয়ে দিলুম। জীবনটাই কেটে গেল ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে। কেন খবরের কাগজওয়ালারা এমন ক'রে এমন কথা আগে লেখে নি! তা হ'লে অনেক আগেই জাগতে পারতুম, জীবনটা এমন ক'রে বৃথা যেত না।

তোমার আজ হ'ল কি বল তো? সেই তেলটা টাকে একটু মালিশ ক'রে দোব?

কি যে বল তার ঠিক নেই। ভাবছ, আমার মাথার গোলমাল হয়েছে? মোটেই না। এতদিন ঘুমিয়ে ছিলাম, আজ জেগেছি, এটা সত্যি কথা।

তুমি যাই বল, আমার কিন্তু বড় ভাবনা হচ্ছে। ডাক্তারবাবুকে একবার খবর দিই, কি বল?

যাও। আমার হয়েছে কি যে, ডাক্তার ডাকবে?

আচ্ছা, তা হ'লে বরং আফিমের কৌটোটা এনে দিই, এক বড়ি খেয়ে একটু ঘুমোও।

দেখ, তুমি এমন অস্থির হয়ে উঠছ দেখে আমার হাসি পাচ্ছে। আমার কিছুই হয় নি। আমি শুধু আজ মনে প্রাণে জেগেছি এবং ঠিক করেছি, ভালবাসব।

বৃদ্ধা সহধর্মিণীর চুপসানো গালেও যেন একটু লজ্জার টোল দেখা গেল। ফিক করিয়া হাসিয়া বলিলেন, এতকাল পরে হঠাৎ এই শুকনো বুড়ীটার দিকে মন ফিরল বুঝি? ব্যাপার কি? খবরের কাগজে বুঝি কোন বুড়োবুড়ীর প্রেমের গল্প বেরিয়েছে?

তোমার এত উৎফুল্ল হবার কোন কারণ দেখতে পাচ্ছি নে। কারণ আমি ভালবাসব বটে, কিন্তু তোমাকে নয়।

মানে? তবু যদি না মাথাটা হ'ত গুল, আর গাল দুটো আমসি। বলি, এ ভীমরতির আসল কারণটা কি, শুনি? কাগজে বুঝি কোন বিধবা পাত্রীর বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে?

না গো, না। ওসব কিছুই না। আমার এ নূতন ভালবাসা নারীপ্রেম নয়।

শুনে প্রীত হলুম। কিন্তু আসল ব্যাপারটা কি, খুলেই বল না?

নেহাতই যদি শুনবে তো, বলি। আমি ঠিক করেছি, হিন্দুকে ভালবাসব। কত শুনি, খ্রীষ্টান খ্রীষ্টানকে ভালবাসে, মুসলমান মুসলমানকে ভালবাসে, জ্যু জ্যুকে ভালবাসে, কাজেই হিন্দু হিন্দুকে ভালবাসবে, এ তো অতি সোজা কথা। এতদিন এই সোজা কথাটা কাগজওয়ালারা ভাল ক'রে লেখে নি কেন, তাই ভাবি! তা যদি লিখত, তা হ'লে আমার এই সত্তর বছরের জীবনটা এমন ক'রে ব্যর্থ হতে পারত না। রোজ সকালে এই কাগজওয়ালারা দুটো ক'রে পয়সা ঠকিয়ে নিয়েছে। এমন সোজা সাদা কথাটা তারা একটু গুছিয়ে ভাল ক'রে কেন লিখলে না!

সত্যিই তো! খ্রীষ্টান খ্রীষ্টানকে ভালবাসে, জ্যু জ্যুকে ভালবাসে, আর হিন্দু হিন্দুকে ভালবাসে না—এ হতেই পারে না। বেশ তো, তুমি এখন থেকে হিন্দুকে ভালবেস, কেমন? কিন্তু তা' ব'লে এই নিয়ে মাথা গরম ক'র না যেন। সত্তর বছর যা গেছে তা গেছে, তা নিয়ে আর অনুতাপ ক'রে কি হবে? ব'স, এক্ষুনি তোমার চা আর মাখন মিছরি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

তোমাকে কিচ্ছু আনতে হবে না। আমি এখুনি বেরুচ্ছি, দেখি আমার চাদরটা। হিন্দুকে ভাল না বেসে আজ জলগ্রহণ করব না।

২

চাদর গলায় ফেলিয়া লাঠিগাছা হাতে লইয়া রামহরিবাবু ভালবাসিতে বাহির হইলেন। এ পাড়া ও পাড়া অনেক ঘুরিলেন। হিন্দুর নানাবিধ দুর্গতির বিষয়ে নানা জনের সহিত নানাবিধ আলোচনা করিলেন। তারপর হিন্দুভক্তি-প্রদায়িনী সমিতি, নিখিল বঙ্গ কায়স্থো-

ন্ধারিণী সমিতি, নিখিল ভারত উপবীত সঙ্ঘ, নিখিল এশিয়া ভজ-গোবিন্দ সভা, নিখিল শ্যামবাজার চন্দনতিলক সঙ্ঘ, কালীঘাট নিরামিষাশী সম্প্রদায়, বাগবাজার গৌরীদান-প্রচারিণী সভা, শিয়ালদহ টিকি-বর্ধিনী সমিতি, নিখিল হ্যারিসন রোড ত্র্যহস্পর্শ সমিতি, সমগ্র কলিকাতা বারেন্দ্র-মণ্ডলী, নারিকেলডাঙ্গা কুলীন মহাসভা, নিখিল চৌরঙ্গী তন্ত্র-সমিতি, অল্ ইণ্ডিয়া মুক্তকচ্ছ সমবায়, অল্ এশিয়া কুক্কুটাশী সভা, অল্ ইণ্ডিয়া গাই-গোত্র প্রকাশক সঙ্ঘ, নিখিল রসা রোড, শূন্য-পুরাণ-প্রচারিণী সভা, নিখিল যোগীপাড়া বাই লেন পরলোকতত্ত্ব প্রচারিণী সভা, অল্ বেঙ্গল হরিবোল সম্প্রদায়, মাধ্যবঙ্গীয় প্রেমে-মাতোয়ারী সঙ্ঘ, প্রভৃতি সমাজ-হিতকর প্রতিষ্ঠানগুলির ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া, ঠুক ঠুক করিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া বাড়ী ফিরিতে সাড়ে বারটা বাজিয়া গেল।

বাড়ী ফিরিয়া চাদরটা ফেলিয়া দিয়া বারান্দার দেওয়ালে পিঠ দিয়া এলাইয়া পড়িলেন। একটু বিশ্রাম করিবার পর এক ডেলা চ্যবনপ্রাশ খাইয়া ফেলিলেন। পরে চাকর আসিয়া মাথায় সাত মিনিট, পায়ে সতরো মিনিট এবং গায়ে সাতাশ মিনিট তেল মালিশ করিবার পর সাঁইত্রিশ মিনিট ধরিয়া স্নান করিলেন। এদিকে আসন পাতিয়া পাখা হাতে করিয়া গৃহিণী অপেক্ষা করিতেছিলেন। আহ্নিক সারিয়া রামহরিবাবু আহারে বসিলেন। বসিয়াই বলিলেন, বেশ হয়েছে।

গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হ'ল ? কাকে কাকে ভালবাসলে ?

রামহরি এ সকল কথায় কান না দিয়াই বলিলেন, বেশ হয়েছে।

কার বেশ হ'ল ? যদু মুখুজ্জের ছেলেটা বুঝি হাকিম হয়েছে ?

যদু মুখুজ্জের ছেলে কি হ'ল না হ'ল, তার জন্যে তো আমার ঘুম হচ্ছে না !

তবে কি হ’ল ? ও বাড়ির মধু ঠাকুরপোর মেয়ের সেই জমিদারের ছেলের সঙ্গে সম্বন্ধটা পাকা হয়ে গেছে বুঝি ?

ছাই হয়েছে। ওর মেয়ে যাবে জমিদারের ঘরে, তুমিও যেমন! যাক, বেশ হয়েছে।

ফের বলছ, বেশ হয়েছে! মেয়েটার বিয়ের ভাবনায় ওর মা-বাপ পাগল হয়ে বেড়াচ্ছে, আর তুমি বলছ, বেশ হয়েছে!

ভাল মুস্কিল! কার মেয়ের বিয়ে হ’ল আর না হ’ল, তা ভাববার আমার সময় নেই।

মধু ঠাকুরপো হিন্দু কিনা, তাই ভাবলুম, তুমি তার ভালমন্দর খোঁজ নিতে গিয়েছিলে। সকালে যে ভীষণ পণ ক’রে বেরুলে, ভাবলুম, তোমার ভালবাসা থেকে আর কারও পরিত্রাণ নেই।

স্বক্তটা শেষ করিয়া, সোনামুগের ডালের বাটি হইতে একটু ডাল পাতে ঢালিয়া, বাঁধানো দাঁত দিয়া বেশন-দেওয়া বেগুনভাজায় একটা কামড় দিয়া রামহরিবাবু বলিলেন, ঠাট্টা রাখ। খাবার সময়ে বাজে কথা ভাল লাগে না। যাক গে, এতদিন পরে—তা হোক, বেশ হয়েছে।

আচ্ছা, ঠাট্টা করছি না, বল তো, কার কি বেশ হ’ল ?

যা হবার তাই হয়েছে। হারু নাপতের ছেলেটা পটল তুলেছে।

ওমা! সেকি! জলজ্যান্ত ছেলেটা! এই সেদিনও তো আমাদের বাড়িতে এসেছিল!

হ্যাঁ হ্যাঁ, সেদিনও এসেছিল। আমি অনেক দিন আগেই বলেছিলাম, হারুর পুত্রশোক হবে।

এমন কথা কি ক’রে মুখে আন ? তোমার এতগুলো ছেলেপিলে, নাতিনাতনী!

মনে নেই সেই বত্রিশ সালের কথা—এই তো বছর বারো তেরো হবে—ব্যাটা ছাগল দিয়ে আমার লাউগাছটা খাইয়েছিল?

মনে আছে বইকি, যে কুরুক্ষেত্র তুমি বাধিয়েছিলে! সে তো হারুর দোষে নয়। ছাগলটা হঠাৎ দড়ি ছিঁড়ে ছুটে গিয়েছিল, তাই। আর সেই ছাগলের দুধ খেয়েই তো আমাদের রাণু বেঁচে উঠল।

দুধ তো আর অমনই দেয় নি, তার দাম নিয়েছিল। আমার অমন সখের লাউগাছটা—তখনই বলেছিলাম, আমার শাপ্ না ফ'লে যায় না।

ছিঃ ছিঃ, কি যে বল! এই বারো তেরো বছর পরে তুচ্ছ একটা লাউগাছের কথা ভুলতে পারছ না? আর তারই জন্যে ওর ছেলে ম'রে গেল দেখে তোমার আনন্দ হচ্ছে! উঃ, এই লোকের সঙ্গে এই ষাট বছর ঘর করছি!

তুচ্ছ লাউগাছ বই কি! সে তোমার আঁস্তাকুড়ের আপ্তজালা লাউগাছ নয়; ফৈজাবাদ থেকে বীচি আনিয়ে সে গাছ তৈরি করেছিলুম। সেই সখের গাছটা খেয়ে ফেললে একটা নাপিতের ছাগলে! ওর পুত্রশোক হবে না তো কার হবে? ব্যাটা নাপিত!

সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯